দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯।।
২৯ অগ্রহায়ণ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১
website : www.eswastika.com

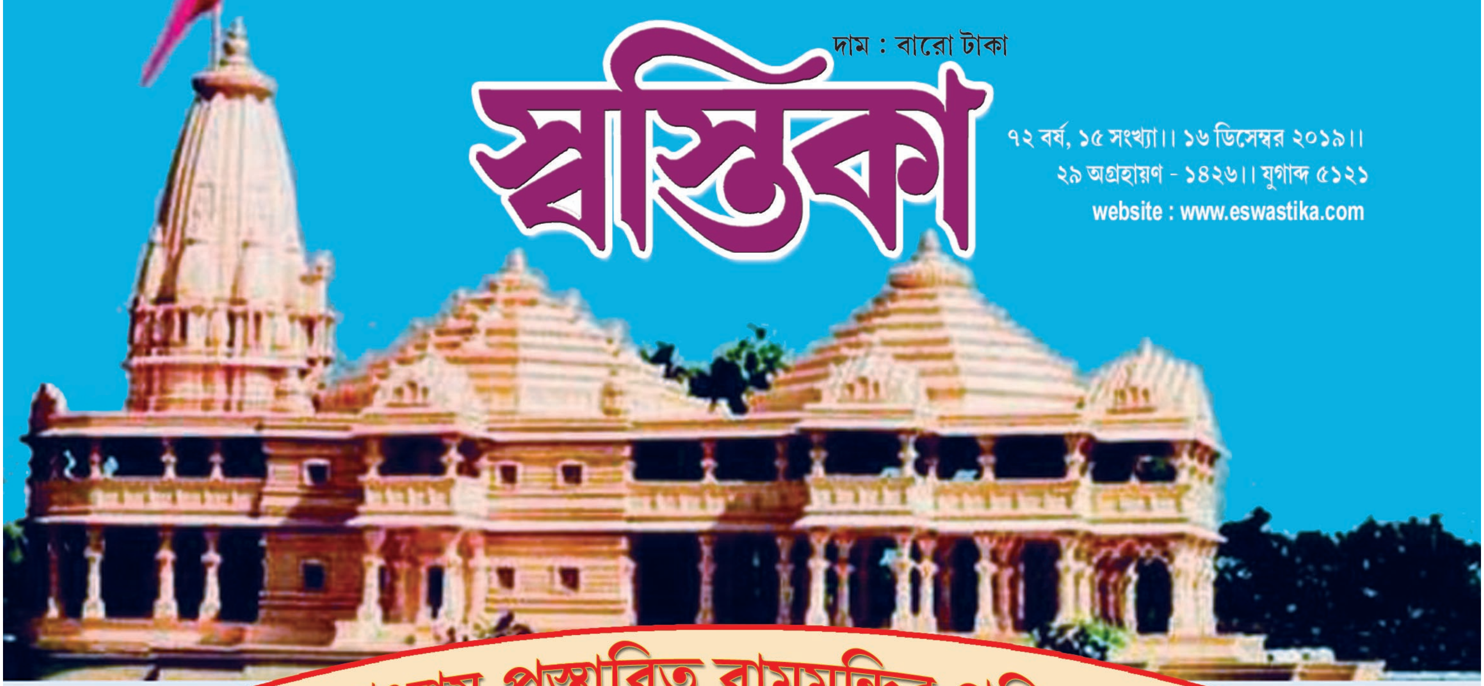

অযোধ্যায় প্রস্তাবিত রামমন্দির পরিসর

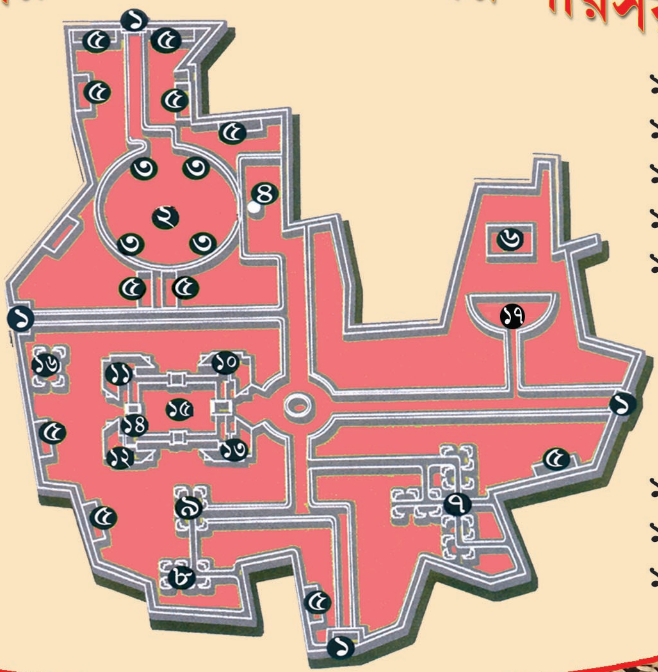

১. চারটি প্রধান প্রবেশ দ্বার।
২. রামমন্দির।
৩. মন্দির সমুদয়— গণেশ মন্দির, হনুমান মন্দির, লক্ষ্মণ মন্দির, সীতা মন্দির।
৪. বিজয় স্তম্ভ।
৫. চৌহদ্দি সংলগ্ন প্রদর্শনী ভবন।
৬. ধ্যান ও সভাকক্ষ।
৭. কর্মী আবাসন।
৮. সন্ত নিবাস।
৯. ধর্মশালা।
১০. গ্রন্থাগার।
১১. গবেষণাকেন্দ্র।
১২. আবাসন বিকাশ ভবন।
১৩. ভোজন কক্ষ।
১৪. প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ— রামায়ণ বিষয়ক, মহাভারত বিষয়ক, গীতা বিষয়ক, অন্যান্য বিষয়।
১৫. কথাকুঞ্জ।
১৬. প্রশাসনিক ভবন।
১৭. পণ্যশালা।

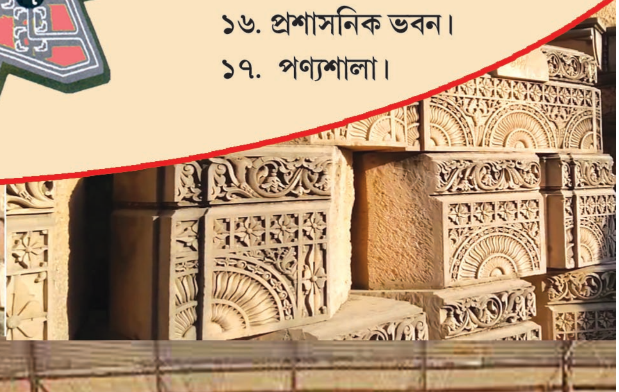

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৬ ডিসেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫

‘ক্যাব’ নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা চলছে ■ বিশ্বামিত্র ■ ৬

খোলা চিঠি : কাঁটার নাম নাগরিকত্ব বিল ■ সুন্দর মৌলিক ■ ৭

ভারতের পাঁচ ট্রিলিয়নের অর্থনীতি হয়ে ওঠার পথে দশটি প্রয়োজনীয় ধাপ ■ গুরুশরণ দাস ■ ৮

হিন্দু বাঙ্গালি বিদ্বেষ নেহরু পরিবারের বংশানুক্রমিক অসুখ ■ সাধন কুমার পাল ■ ১১

আধুনিক ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও ক্ষুধামুক্ত ভারত ■ পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায় ■ ১৩

সদ্‌ভাবনার পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের বড়ো রায় ■ গৌতম কুমার মণ্ডল ■ ১৫

ইজরায়েলি মডেল অনুসরণ করলে উপকৃত হবেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ■ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ■ ১৭

রামজন্মভূমি আন্দোলন ■ মিতা রায় ■ ২৩

রামমন্দির রাষ্ট্রীয় অস্মিতার প্রতীক ■ সঞ্জয় সোম ■ ২৪

রামজন্মভূমি মামলার রায়ের বীজ লুকিয়ে ছিল লাহোরের শহিদগঞ্জ মসজিদ মামলায় ■ সুজিত রায় ■ ২৬

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে হিন্দু, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুস্থানের জয় ■ করুণা প্রকাশ ■ ২৯

‘সশক্তিক নমি তব পদে’ ■ স্বপ্না কুণ্ডু ■ ৩১

ভারত মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর ■ অসিত কুমার সিংহ ■ ৩৩

গল্প : শিকার ■ বরুণ দাস ■ ৩৫

গল্প : দলুকাকা ■ বারিদবরণ বিশ্বাস ■ ৩৭

শ্রীরামজন্মভূমির পুনরুদ্ধার হিন্দু অস্মিতার জয় ■ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ■ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ■ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ■ **অঙ্গনা : ২১** ■

সুস্বাস্থ্য: ২২ ■ **অন্যরকম : ৩৯** ■ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ■

চিত্রকথা : ৪২ ■ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯** ■

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৩ ডিসেম্বর
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৩ ডিসেম্বর
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯

ভারতের রাজনীতিতে শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা নিয়ে প্রায়শই ধর্মনিরপেক্ষ এবং বাম দলগুলি তরজা শুরু করে। তাদের দাবি, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরও শরণার্থীর মর্যাদা দিতে হবে। এই দাবির পিছনের কারণটি সম্বন্ধে সকলেই কমবেশি ওয়াকিবহাল। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজনৈতিক স্বার্থ না দেশের নিরাপত্তা, কোনটি আগে? যে দেশ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে এবং দেশভাগের পর থেকেই শরণার্থী সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে— সে দেশের নাগরিকত্বের ভিত্তি ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু হওয়া কি সম্ভব? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯। শরণার্থী সমস্যা, নাগরিকত্ব এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা করবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, মোহিত রায়, বিমল শঙ্কর নন্দ প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

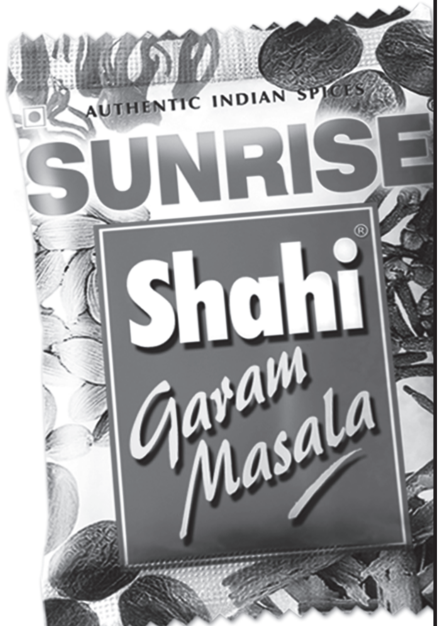

SUNRISE
PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এক দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম

দীর্ঘ প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই দেশের হিন্দু সমাজ যে মহত্তর আন্দোলনটি করিয়া আসিয়াছে, অবশেষে সেই আন্দোলন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আন্দোলনের সুফল হিন্দু সমাজ লাভ করিয়াছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিন্দু সমাজের দাবি মানিয়া লইয়া অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণের রায় প্রদান করিয়াছে। রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলিয়াছে, আগামী তিন মাসের ভিতর একটি অছি পরিষদ গঠন করিয়া রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করিতে হইবে। রামজন্মভূমির অধিকার দাবি করিয়া হিন্দু সমাজ এক সুদীর্ঘ সময় লড়াই করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনকাল হইতেই এই লড়াই শুরু হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতেও এই লড়াইয়ে ছেদ পড়ে নাই। এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া কোনো আইনি লড়াইয়ের নিদর্শন বোধ করি পৃথিবীতে নাই। স্বাধীনতার পরেও সাত দশক ধরিয়া হিন্দু সমাজকে বারে বারে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহাদের ন্যায্য দাবিকে মান্যতা না দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নানাবিধ অজুহাতে দীর্ঘসূত্রিতা করিয়া রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার শুনানি এবং রায়দান পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ সত্ত্বেও হিন্দু সমাজ হতোদ্যম হয় নাই, তাহাদের মনোবলও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। বরং, রামজন্মভূমিতে রামমন্দিরের অধিকার আদায় করিতেই হইবেই—এই দৃঢ় সংকল্পে তাহারা চরম আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। অযোধ্যায় রামমন্দির ধ্বংস করিয়া বিদেশি আগ্রাসনকারী বাবর যে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়া নিজ শৌর্যের পরিচয় দিয়াছে হিন্দু সমাজ। তাহারা বুঝাইয়া দিয়াছে, ভারতীয় সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন হিন্দু সমাজ কখনই মানিয়া লইবে না। রামমন্দিরের দাবিতে আন্দোলন করিতে গিয়া এই পশ্চিমবঙ্গেরই দুই যুবক পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়াছেন। পুলিশের নিপীড়নকে অগ্রাহ্য করিয়াই এই আন্দোলন অগ্রসর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ কারাবরণ করিয়াছেন। স্বয়ং লালকৃষ্ণ আদবানীর মতো জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেও কারাবরণ করিতে হইয়াছে। তবু এই আন্দোলনকে দমিত করা যায় নাই। হিন্দু সমাজের এই মরণপণ সংগ্রামকে অবশ্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবে। নিজ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু সমাজ যে উন্নত শিরে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিতে পারে—রামমন্দির আন্দোলন তাহারই নিদর্শন।

দীর্ঘ দেড়শত বৎসরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাইয়া রামজন্মভূমি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মামলার রায়টি প্রদান করিয়াছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির এক ডিভিশন বেঞ্চ। এইরকম একটি ঐতিহাসিক রায়দানের জন্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হইবেন। ধন্যবাদার্হ হইবেন এই কারণেই যে, তিনি তাঁহার পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অযথা কালক্ষেপ করেন নাই। বরং, তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দেশের মানুষ একটি সুস্পষ্ট মতামত জানিতে চাহে; অযথা কালক্ষেপ করিলে দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। বিচারপতি গগৈ ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন, রামমন্দির নিছক একটি হিন্দু মন্দির নহে। সমগ্র ভারতবর্ষের, সমগ্র ভারতবাসীর অস্মিতার প্রতীক। ভারতবাসীর আবেগ ইহার সঙ্গে জড়িত। বিচারপতির গগৈয়ের এই উপলব্ধিতে যে কোনো ভুল ছিল না—তাহা বুঝা গিয়াছে রায় প্রকাশ হইবার পর। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী এই রায়ে খুশি হইয়াছে, এই রায়কে স্বাগত জানাইয়াছে। কতিপয় ব্যক্তি রায়ের বিরোধিতা করিলেও—কেহই তাহাতে গুরুত্ব দিতেছে না। ভবিষ্যতে রামজন্মভূমিতে রামমন্দির আত্মপ্রকাশ করিবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে।

সুভাষিতম্

অসংশয়ং মহবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।। (গীতা ৬/৩৫)

হে মহাবাহো! মন নিঃসন্দেহে চঞ্চল এবং একে বশে রাখা দুষ্কর। কিন্তু হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা একে বশ করা যায়।

'ক্যাব' নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা চলছে

এই প্রতিবেদন লেখার সময় সংসদের নিম্নকক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিপুল ভোটে (ক্যাব) পাশ হয়ে গিয়েছে। আশা করা যায় সংসদের উচ্চকক্ষেও তা আটকাবে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাদের চারপাশে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে যে সমস্ত কথাবার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা দেশের সুরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। শুধু সোশ্যাল মিডিয়া কেন, পশ্চিমবঙ্গের কিছু নিউজ মিডিয়াও যে আচরণ করছে, তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। ভাবতে অবাক লাগে মহম্মদ আলি জিন্না যাদের সমর্থনে পাকিস্তান গড়ার ডাক দিয়েছিলেন, তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরসূরীরা আজ তাদের সেই 'পিতৃদেব'কে আড়াল করছে অদ্ভুত উপায়ে। জিন্নার নেতৃত্বে সেদিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ডাক শুনিয়ে হিন্দুদের নির্বিচারে 'কোতল' করা হয়েছিল। আজ সংসদে দাঁড়িয়ে সিপিএমের 'মুসলমান' সাংসদ একইভাবে বলছেন 'আমরা ভারতীয় বাঙ্গালি, ওরা বাংলাদেশি বাঙ্গালি, কিন্তু মনে রাখবেন আমরা উভয়েই বাঙ্গালি'। এই বাঙ্গালি জিগিরের কথা ১৯৪৭-এ মনে পড়েনি। 'বাঙ্গালি মুসলমান'রা কীভাবে 'বাঙ্গালি হিন্দুদের' দেশত্যাগী করেছিল তাও না। ১৯৭১-এ অবশ্য পিঠ বাঁচাতে মনে পড়েছিল 'বাঙ্গালিয়ানা'র কথা। তারপর আবার যে কে সেই। বাঙ্গালিওয়ালা বাংলাদেশ তার 'মুসলমান সত্তা' বিসর্জন দেবে কোন দুঃখে।' বাঙ্গালি খানসেনা তৈরিতে বাংলাদেশের কৃতিত্ব কী ভোলা যায়?

১৯৪৭-এও কিছু হিন্দু-নামধারী জেহাদে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের জ্যাকেট গায়ে চড়িয়েছিল কমিউনিস্ট ছদ্মনামের আড়ালে। তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরপুরুষরা সাধারণ ভাবে ধুয়ে মুছে গেলেও সোশ্যাল মিডিয়া ও নিউজ মিডিয়ায় তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। এমনকী বর্তমান রাজ্য যে দলের সরকার চলছে তাদের পুরনো কর্মীরাও আজ দলের কাছে বোঝা মাত্র, তার জায়গায় ভোটবাজারে অস্তিত্ব বিলুপ্ত দলত্যাগীরা মতাদর্শ ত্যাগ না করেই শাসকীয় আঁচলে মুখ লুকিয়ে আসল খেলা খেলে চলছে। আর এদেরকে যারা এককালে শ্রেণীশত্রু বলে মনে করত, সেই চরমপন্থীরা আজ অবলুপ্তির বিপদের দিনে এই ছায়াতলে মিশেছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনী ছবিটার দিকে তাকালেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

বিপদের বার্তাটা হিন্দুদের এখনই পড়তে হবে। ১৯৪৭-এর যে বিপদ সংকেত বুঝেও

বিশ্বামিত্র-র কলম

না বোঝার ভান হিন্দুরা করেছিল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তার মাশুল দিতে হয়েছে। বাহাত্তুরে স্বাধীনতা কাটিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ যার প্রথম পদক্ষেপ। বাবরি ধাঁচার স্মৃতি মুছে রামমন্দির নির্মাণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয়ত্বের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা যার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। তৃতীয় পদক্ষেপ হবে প্রতিবেশী দেশের ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষকে এদেশে

> **একজনও হিন্দু ভারত থেকে বিতাড়িত হবেন না। বরং প্রতিবেশী দেশে অত্যাচারিত হলে ভারতের দ্বার আপনার জন্য অবারিত।**

জায়গা করে দেওয়া আর ভারতের আর্থিক স্থিতিকে বিনষ্ট করতে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করা হবে যার চরম পদক্ষেপ। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান যেমন মানুষের ন্যূনতম চাহিদা, তেমনি ভারতকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করতে, ভারতবাসীকে ভবিষ্যতে নিরাপত্তা দান করতে এগুলিই হলো ন্যূনতম চাহিদা।

ভারতের দারিদ্র্য যাদের ব্যবসায়িক মূলধন, চীনের চেয়ারম্যান যাদের চেয়ারম্যান, যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানের মৃত্যুতে উৎফুল্ল হয়, এদের অনেকে হিন্দু-নামধারী হলেও হিন্দুর সর্বনাশে এদের মতো সক্রিয় আর কেউ নয় এটা সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে। জৈশ সমর্থক এদের মুখপত্রে প্রথম পাতায় এই প্রসঙ্গ শিরোনাম হয়েছে— 'ধর্ম নাগরিকত্ব সংবিধান স্বীকৃত?' সাধারণ জনগণের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা গত সপ্তাহে 'অনুপ্রবেশকারী' ও 'উদ্বাস্তু'র সংজ্ঞা দেখিয়েছিলাম। এখানে পুনরাবৃত্তির দরকার নেই। শুধু বলার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী একমাত্র মুসলমানরাই 'অনুপ্রবেশকারী' হওয়ার যোগ্য, অমুসলমানরা 'উদ্বাস্তু'।

একটা বিষয় ইচ্ছাকৃত ভাবে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে 'সব মুসলমানই অনুপ্রবেশকারী', 'বাংলাদেশি হিন্দুদেরও তাড়ানো হবে।' একথা ঠিক যে সব অনুপ্রবেশকারীই মুসলমান, কিন্তু সব মুসলমান অনুপ্রবেশকারী নন। ফলে এই দ্বিতীয়োক্তরা ভারতে নির্ভয়ে থাকুন, আরবের পা-চাটা দালাল হিসেবে নয়, ভারতীয় হিসেবে। একজনও হিন্দু ভারত থেকে বিতাড়িত হবেন না। বরং প্রতিবেশী দেশে অত্যাচারিত হলে ভারতের দ্বার আপনার জন্য অবারিত। আশা করা যায় হিন্দুরা এবং ভারতীয় ইসলাম-উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্গতরা সুখে-শান্তিতে আগামীদিনে থাকবেন এবং শক্ত ভারত সমর্থ ভারতের পত্তন হবে। ■

কাঁটার নাম নাগরিকত্ব বিল

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

নাগরিকত্ব বিল নিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। এমনকী কংগ্রেস নেতা শশী তারুর বলেছেন, মোদী-অমিত শাহ ভারতকে 'হিন্দু পাকিস্তান' বানাতে চাইছেন। অন্যদিকে লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী, তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, সরকার অসাংবিধানিক কাজ করছে। সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা লঙ্ঘন করতে চাইছে মোদী সরকার। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

তার আগে জেনে নেওয়া যাক মোদী সরকারের বক্তব্য কী? এই পরিস্থিতিতে অমিত শাহ যেন যুক্তি সাজিয়েই রেখেছিলেন। বিল পেশ করে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ''সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় তো সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে, তাহলে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল কংগ্রেস?'' তাঁর কথায়, ''এমন নয় যে নাগরিকত্ব আইন এই প্রথম সংশোধন করা হচ্ছে। এর আগে ইন্দিরা গান্ধীও ৭১ সালে এই আইন সংশোধন করেছিলেন। তখন বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।'' একথা বলেই অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন, কেন পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের তখন নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়নি। আসলে সমস্যার শিকড়ে রয়েছে কংগ্রেসের ভ্রান্ত নীতি। কংগ্রেস যদি ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ না করত তাহলে আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

এখানেই থামেননি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, আপনারা কি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সংবিধান দেখেছেন? ওদের সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে তারা ইসলামিক রাষ্ট্র। সেখানে মুসলমানদের ধর্মাচারণে কোনও বাধা নেই। কিন্তু সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের বেছে বেছে নিগ্রহ করা হচ্ছে।

অমিত শাহর কথায়, দেশভাগের সময় নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে বলা হয়েছিল, দু'দেশই সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। ভারত সেই কথা রেখেছে। কিন্তু পাকিস্তান কথা রাখেনি। তাই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

সংখ্যালঘু শরণার্থীদের প্রসঙ্গও এদিনের বক্তৃতায় উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই বিল পাশ হওয়ার পরেও পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশের কোনও মুসলমান সজ্জন যদি ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন, তখন অবশ্যই তা বিবেচনা করে দেখা হবে।

এই যুক্তির পরে সত্যিই কি কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে! আমাদের দিদি যখন প্রশ্ন তুলেছেন তখন অবশ্যই পারে। দিদি বলেছেন, ''এনআরসি আর নাগরিকত্ব সংশোধন বিল--- দুটোই কয়েনের এপিঠ-ওপিঠ। কিন্তু আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা থাকতে কারও ক্ষমতা নেই কাউকে ওরা দেশ ছাড়া করবে।''

দিদি আরও বলছেন, ''আমাদের ভোটার কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, রেশন কার্ড আছে। তাহলে আবার কিসের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে? ওরা মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি করতে করতে চাইছে। আমরা বলছি কোনও ডিভাইড অ্যান্ড রুল চলবে না। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এসব করতে দেব না।''

সুতরাং যুদ্ধ হবে। দিদি জিতবেন না হারবেন সেটা জানি না কিন্তু যুদ্ধ একটা হবেই। দিদির পাশে গোটা পশ্চিমবঙ্গ আছে। দিদিতে যতই মানুষের অনাস্থা থাকুক সদ্য সদ্য দিদি তিনটে উপনির্বাচনে জিতেছেন। হ্যাঁ, এনআরসি নিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়েই জিতেছেন। ওটা তিনি করেই থাকেন। তাতে আর যার লাভ হোক না হোক দিদির লাভ হয়। অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। এটা হলফ করে বলা যায়। আসলে দিদির ভুল প্রচারের জবাবে ঠিক প্রচারটা করার লোক কই! অমিত শাহ লোকসভায় দাঁড়িয়ে যেটা বলেছেন সেটা তো সাধারণের দরবারে দাঁড়িয়েও বলতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে। এই বিল দেশের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের জন্য, অর্থনীতির জন্য, সুরক্ষার জন্য কতটা প্রয়োজনীয় সেটা তো বোঝাতে হবে নাকি!

আর সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে দিদি যা বলবেন সেটাই মানুষ বিশ্বাস করবে। সুতরাং যুদ্ধ হবেই...

—সুন্দর মৌলিক

ভারতের পাঁচ ট্রিলিয়নের অর্থনীতি হয়ে ওঠার পথে দশটি প্রয়োজনীয় ধাপ

অতিথি কলম

গুরুশরণ দাস

এ বছরের ৪ নভেম্বর দিনটি আমাদের পক্ষে খুব একটা ভালো ছিল না। Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)-এর সম্মেলন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেষ মুহূর্তে ঘোষণা করলেন ভারতের পক্ষে এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এখন সম্ভব নয়। তিনি আলাদাভাবে চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রসঙ্গ তোলেন। বৃহত্তর বিশ্ব বাণিজ্যিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে এটি একটি বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে এটি সাধারণ কোনো বাণিজ্যচুক্তি নয়, সমগ্র এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রশ্ন এখানে জড়িয়ে আছে। ভারত যদি এই চুক্তির অংশীদার হতো সেক্ষেত্রে RCEP বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (free trade Zone) হয়ে উঠতে পারত। ১৬টি দেশ সদস্য হওয়ার ফলে বিশ্বের লোকসংখ্যার অর্ধেক, বিশ্ব বাণিজ্যের ৪০ শতাংশ ও সারা বিশ্বের ৩৫ শতাংশ সম্পদের অধিকার এই সম্মিলিত এশীয় বাণিজ্যিক সংস্থার করায়ত্ত হতো।

আমার মনে হয় ভারত RCEP-তে থাকলেও থাকতে পারত। চুক্তির যে শর্তগুলি ছিল তা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আশঙ্কাগুলোর নিরসনকারী হতে পারত। কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানি বা দুগ্ধজাত দ্রব্য (যেমন নিউজিল্যান্ড থেকে) যাতে না আসে তার জন্য আমাদের কৃষকদের নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা ছিল। সামগ্রিক আমদানিযোগ্য চীনা পণ্যের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। বাকিগুলি ওপর ৫ থেকে দীর্ঘমেয়াদের ২৫ বছর অবধি শুল্ক চাপানোর প্রস্তাবও সম্মতি পেয়েছিল। সামগ্রিক প্রস্তাবিত চুক্তিতে ৬০টি খুব জরুরি ভোগ্য বা সংবেদনশীল পণ্যের চীন থেকে আমদানি যাতে হঠাৎ করে লাফিয়ে না বেড়ে যায় তার রক্ষাকবচের শর্ত থাকার কথা হয়েছিল।

দেশের হিতের জন্যই আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে এশিয়ারই অন্য ছোটো দেশগুলি যেমন— ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, লাওস, মায়নামার যদি প্রতিযোগিতায় নেমে RCEP-এর সদস্য থাকতে পারে ভারত কেন পারবে না? আমাদের কেন বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক সংরক্ষণের সুবিধে নিতে হবে? যা সাধারণত যে দেশে শিল্পোন্নোয়ন নিতান্তই শৈশব অবস্থায় রয়েছে তাদের নিতে হয়। স্বাধীনতার ৭২ বছর পরও কেন আমাদের সংস্থাগুলি এখনও নাবালক অবস্থায় রয়েছে? বিশ্বের কোন দেশ রপ্তানি ছাড়া সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারে না। মুক্ত অর্থনীতি অনুসরণকারী দেশগুলি সবসময় সরকার পরিচালিত অর্থনীতির দেশগুলিকে ছাপিয়ে গেছে। ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠতে আমাদের রপ্তানি ছাড়া কোনো পথ নেই। RCEP-এর সাম্প্রতিক অবস্থানের পর ভারতকে একমাত্রিক লক্ষ্য নিয়ে এমন কিছু সংস্কারে হাত দিতে হবে যাতে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় আমরা টিকে থাকতে পারি, রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে পারি। ২০২০-এর মার্চের মধ্যে আমাদের কিন্তু আবার RCEP-তে যোগ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কি আমরা নিজেদের একটু গুছিয়ে নিতে পারি না? আপ্তবাক্যটি মনে রাখতে হবে, সঠিক কাজ করার প্রশ্নে দেরি হওয়াটা কখনই প্রতিবন্ধক হতে পারে না। সেই কাজগুলি করে আমাদের দেশকে প্রতিযোগিতা-সফল করে তুলতে আমি দশটি নিদানের কথা বলছি।

(১) প্রথমত হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। অতীতের রপ্তানি বাণিজ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নেতিবাচক মনোভাব যার পরিণতিতে আমাদের সমগ্র বিশ্বের রপ্তানির অংশ এখনও মাত্র ১.৭ শতাংশ। নিরক্ষরবাদীরা সর্বদাই বাণিজ্য ঘাটতির আতঙ্কে ভোগেন। তাঁরা ভুলে যান কম দামের, উচ্চমানের জন্য আমদানি করে বিশ্বের আমদানি-রপ্তানি শৃঙ্খলের সঙ্গে জড়িত থাকা প্রয়োজনীয়। দেশের উৎপাদকদের, শিল্পোদ্যোগীদের আমদানিকৃত পণ্যের সঙ্গে সফলভাবে লড়ার চেষ্টা করলে তাঁরাই আরও কুশল ও পারদর্শী হয়ে উঠবেন। প্রতিযোগিতাক্ষম হয়ে ওঠার প্রচুর সুযোগ থেকে যায় বিদেশিদের কৃৎকৌশলের সঙ্গে লড়ার। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রস্তাব তো ভালোই তবে আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করে নয়। আমাদের 'মেক ইন ইন্ডিয়া ফর দি ওয়ার্ল্ড' করতে হবে। যারা বার বার বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে অযথা গলা চড়িয়ে যাচ্ছেন তাঁদের জানা দরকার ২০১৩-১৮ এই পাঁচ বছরে ভিয়েতনামের রপ্তানি ৩০০ শতাংশ বেড়েছে যেখানে ভারত প্রায় স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলেছে। বাড়বৃদ্ধি বিশেষ নেই। এর মধ্যেই রয়েছে রুপালি রেখা। আমাদের বিশ্বে রপ্তানি শতাংশ এতই কম যে এতে কিছুটা বৃদ্ধি ঘটাতে পারলেই 'আচ্ছে দিন' চলে আসতে পারে।

(২) আমাদের শুল্কের হার কমাতেই হবে। আমদানি শুল্ক হারে আমরা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিগত কয়েক বছরে ৯ বার শুল্ক বৃদ্ধি ঘটিয়ে আমরা পরিস্থিতিকে চরম খারাপের দিকে নিয়ে গেছি। পৃথিবীর কুশলী দেশগুলির বেশিরভাগই একটা সময়ের পর শুল্ক তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বিদেশ থেকে সস্তায় আমদানি করলে আমাদের দেশের শিল্পোদ্যোগীরা সেই কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজেদের দক্ষতায় নতুন উৎপন্ন বস্তুটিকে রপ্তানিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে পারে। উৎপাদন ক্ষেত্রে নৈপুণ্যও ক্রমশ বাড়তে পারে।

(৩) জাতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে গেলে কম করে দশটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও বিভিন্ন রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগে কাজ করতে হবে। কেবলমাত্র অপ্রস্তুত বাণিজ্য মন্ত্রকের হাতে সব ছেড়ে দিলে হবে না। একজন প্রবীণ উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাবিনেট পদমর্যাদার মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এ কাজে হাত দিতে হবে। ক্ষমতায় মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির সমকক্ষ হয়ে উঠতে হবে তাঁকে। যাতে তিনি বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে তালমিল রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার হলে সেগুলি ক্ষমতাবলে করে নিয়ে যাতে দেশ প্রতিযোগিতা সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে কেবল সেটাই দেখবেন। আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রকের কথায় কেউই কান দেয় না।

(৪) এই কাজে আমলাতন্ত্রের শ্লথতা বড়ো

বাধা। ease of doing business-এর ওপর সদা কড়া নজর রাখতে হবে। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক বা আধিকারিকদের সঙ্গে নাগরিকদের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। যা কিছু পারস্পরিক প্রয়োজনীয় যোগাযোগ তা অনলাইনে সেরে নিতে হবে। কাগজ, নথি সবই অনলাইনে স্থানান্তরিত করে নিতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনের দ্রুততা ও সাফল্য (Enforcement of Contract)। এক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা কমিয়ে নিশ্চয়তা বাড়াতে হবে। সারা বিশ্বের চুক্তি সম্পাদনের সাফল্যে ভারতের হার খুবই খারাপ।

(৫) আমার মতে টাকার মূল্যমান বা বিনিময় হার ডলার সাপেক্ষে সঠিক নেই। আরও নেমে গিয়ে ৮০ টাকা প্রতি ডলার হওয়া দরকার। সেটা হলে আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানিকারকদের নানা ধরনের ডলার মূল্যমানজনিত দেয় জরিমানা অনেক কমে যাবে। ডলার বিনিময় মূল্যকে দেশের কোনো সম্মাননীয় স্মারক হিসেবে ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কমিয়ে তা আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলির সমান করতে হবে।

(৬) আমাদের স্থবির শ্রম আইন যা শ্রমিকের বদলে কেবল চাকরিটিকে সংরক্ষণ করে রাখার বিষয়ে বেশি সজাগ তার সংস্কার করতেই হবে। অর্থনীতির নিম্নগতির সময় কোম্পানিগুলিকে টিকে থাকতেই হবে। যখন বাস্তবে জিনিসপত্রের অর্ডার কমে আসে অবিক্রিত মাল জমতে থাকে তখন হয় ছাঁটাই করতে হবে নয়তো সর্বস্বান্ত ঘোষিত হতে হবে। শিল্পক্ষেত্রে সফল দেশগুলি নিয়োগকর্তাদের 'hier and fire'-এর সুযোগ দেয় কিন্তু যাদের চাকরি থেকে অপসারিত করা হলো তাদের জন্য একটি নিরাপত্তার রক্ষাকবচ রাখে। ভারতেও একটি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল নির্মাণ করা দরকার (যেখানে সংস্থার মালিক ও সরকার পক্ষ নিয়মিত টাকা জমা করবে)। যখন ছাঁটাইয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে সেই তহবিলের অর্থে অন্তবর্তী সময়ে তাদের ভরণপোষণ ও নতুন প্রশিক্ষণ চলতে পারে। একবার পেতে পারলে সারা জীবন সেই চাকরি করে যাওয়া যাবে এমনটা এখন ভাবা ভুল।

(৭) শিল্পের জন্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১ একর জমি জোগাড় করাই একটি খরচসাপেক্ষ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। ইউপিএ-২ -এর আমলে চালু করা বর্তমান আইনে জমি নিতে গেলে কয়েক শত মালিকের (পরিস্থিতি অনুযায়ী বেশি কম হতে পারে) সই নিতে হবে। এই ধরনের আমলাতন্ত্রের বেড়াজালকে পার করার দুঃস্বপ্ন শিল্পস্থাপনের আগের পর্ব। এর পরিবর্তন করে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ও সহজে যাতে শিল্পোন্নোয়নের জমি মেলে তেমন আইন করতে হবে। বস্তুত প্রথম মোদী সরকারের আমলে এই ধরনের আইন লোকসভায় পাশও হয়ে গিয়েছিল, রাজ্যসভায় বিরোধীদের বাধায় আটকে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মোদী সরকারের হাতে তুলনামূলক ভাবে ভালো সংখ্যা রয়েছে সেই কারণে জরুরি ভিত্তিতে আইনটি পাশ করা দরকার।

(৮) কৃষকদের শিল্পে-নিযুক্ত কর্মী হিসেবে গণ্য করতে হবে, নিছক কৃষক হিসেবে নয়। আগে থেকেই কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা দরকার। হঠাৎ আমদানি করার বা খুব বাড়তি মজুত হয়ে গেছে রপ্তানি করা প্রয়োজন এমন আচমকা নীতি মোটেই কাজের নয়। এর ফলে একই সঙ্গে কৃষক ও বিদেশি গ্রাহক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

(৯) ভারতীয় উদ্যোগপতিরা রপ্তানি বাজারে তাদের প্রতিযোগীদের থেকে বিদ্যুৎ, পরিবহণ মাশুল ইত্যাদিতে অনেক বেশি টাকা জরিমানা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এর কারণ বিদ্যুৎ, মাশুল ভাড়ায় যেহেতু কৃষককে ভরতুকি দেওয়া হয় যেমন রেলে কৃষিপণ্য চাপানোর ওপর কিছু discount থাকে এতে আন্তর্জাতিক বাজারে ওই ছাড়ের থেকে অনেক বেশি বাদ দিয়ে মূল্যমান ঠিক করা হয়। ফলে রপ্তানিতে আর লাভ থাকে না। এই ধরনের ভরতুকি তুলে নিতে হবে।

(১০) ঠিক কী কাজে লাগতে পারে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে তেমন পরিবর্তন করে চাকরি পাওয়ার যোগ্য স্নাতক তৈরি করতে হবে। ভারতে প্রতিযোগিতার উপযোগী করতে এই দশটি কথার কোনোটিই নতুন নয়। কিন্তু যেহেতু দেশে একটি অর্থনৈতিক মন্দার ভাব এসেছে সেটি কাটিয়ে উঠতে এগুলি যাতে দ্রুত রূপায়িত হয় তাই আবার মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সরকার কোম্পানি করে বড়ো ছাড় দিয়ে তার সদিচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

(লেখক প্রাক্তন আমলা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষক)

রাষ্ট্রায় স্বাহা, রাষ্ট্রায় ইদং ন মম

গ্রাম বিকাশের জন্য একবছর সময় দান করুন

আমাদের সংস্থা গ্রাম বিকাশের দ্বারা গো-ভিত্তিক জৈবিক কৃষিকাজ, বর্ষার জল সংগ্রহের ডোবা খনন, বাড়ি বাড়ি তরিতরকারি ও ফলের বাগান তৈরি, গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট, গ্রামোদ্যোগের মাধ্যমে রোজগার ইত্যাদি গতিবিধি চলছে।

একটি গোরুর গোবর-গোমূত্র থেকে ৫ একর জমিতে কৃষিপদ্ধতি শেখানো, গ্রামীণ উৎপাদন বিক্রির ন্যায্যমূল্য পেতে সহযোগিতা করার কাজও গ্রামবিকাশের মাধ্যমে চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে এই জ্ঞান-আলোক পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রেমী, গো-প্রেমী, সেবা-ভাবী যুবক-যুবতীদের আহ্বান করা হচ্ছে, যারা বাড়ি ছেড়ে ন্যূনতম এক বছর সময় এই মহৎ কাজের জন্য দান করবেন।

এই বিষয়ে পথনির্দেশ, প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সংস্থার দ্বারা করা হবে। বয়সসীমা ৩৫-৫০ বছর।

সম্পর্ক সূত্র—

গো-গ্রাম বিকাশ

Mobile : 8100330044

E-mail : gosevaparivar@gmail.com

রম্যরচনা

কর্মখালির বিজ্ঞাপন

১৮-৩৫ বছর বয়েসী যে কোনও পুরুষ এবং মহিলা আবেদন করিতে পারিবেন।

কাজ : ধান কাটা, বাঁধা ও ঝাড়া।

যোগত্যা : মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক/বি.এ/এইট পাশ/ ফোর পাশ সব চলিবে।

নিয়মাবলী : জমিতে কর্মরত অবস্থায় তোলা দুই কপি রঙিন ছবি আনিতে হইবে। এছাড়া আধার কার্ডের জেরক্স কপি, ছেঁড়া জামাকাপড় এবং গামছা আনিতে হইবে।

বেতন : কাজ অনুসারে পাবেন।

বিশেষ সুবিধা : বিড়ি, গুটখা, খইনি পাবেন।

বিশেষ শর্ত : নিজ নিজ কাস্তে আনিতে হইবে।

জমির মালিকের বক্তব্য : আমরা দু-তিন মাস দেখিব তারপর চাকুরি স্থায়ী হইবে।

* * *

শিক্ষক ক্লাসে প্রশ্ন করলেন, বাঙ্গলার শেষস্বাধীন নবাব কে ছিলেন? পল্টু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পেঁয়াজুদ্দিন চৌধুরী স্যার।

উবাচ

"কংগ্রেস দেশভাগ না করলে নাগরিকত্ব সংশোধনী এই বিলের আজ প্রয়োজনই পড়ত না। এই বিল উত্থাপন করার পেছনে কোনো রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা নেই। এই বিল পাশ হলে কোটিরও বেশি মানুষ নির্যাতিত জীবন থেকে রেহাই পাবেন এবং ভারতের নাগরিক হবেন।"

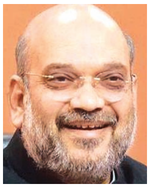

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশের সময় বিরোধী সদস্যের প্রশ্নের জবাবে

"কর্ণাটকের জনগণ নিজেরাই নিশ্চিত করেছেন যে কংগ্রেস আরজেডি (এস) আর তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন না। জনাদেশ চুরির শিক্ষা পেয়েছে কংগ্রেস।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

কর্ণাটকে উপনির্বাচনে বিজেপির জয় প্রসঙ্গে

"রামমন্দির তৈরি হলে শুধু অযোধ্যা নয়, বদলে যাবে সারা দেশের ভবিষ্যৎ।"

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে

আচার্য সত্যেন্দ্র দাস মহারাজ
রামলালার পুরোহিত

"পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্যই এনআরসি ও ক্যাবকে সকলের স্বাগত জানানো উচিত। যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন তাঁরা রাজ্যের উন্নতি চান না।"

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে

কৈলাস বিজয়বর্গীয়
বিজেপি নেতা

হিন্দু বাঙ্গালি বিদ্বেষ নেহরু পরিবারের বংশানুক্রমিক অসুখ

সাধন কুমার পাল

১৯৫০ সালের শুরুতে পাকিস্তান সরকারের মদতে নতুন নতুন এলাকায় হিন্দু নিধন শুরু হয়। এই নিধন কর্মসূচিতে খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর জেলায় পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ফলে আবার পশ্চিমবঙ্গমুখী উদ্বাস্তুর ঢল নামে। সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত পঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের নিয়ে। সমস্ত বাঙ্গলায় উদ্বাস্তু সমস্যা দেখার জন্য ডেপুটি কমিশনার স্তরের একজন মাত্র আধিকারিককে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২ মার্চ সে সময়ের কেন্দ্রীয় পুর্বাসন কমিশনার মোহনলাল সাক্সেনা পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বৈঠক করেন। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ড. মেঘনাথ সাহাও এই বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন। এই বৈঠকে মোহনলাল সাক্সেনা বাঙ্গলায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে কেন্দ্রের জওহরলাল নেহরুর সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের শুধু মাত্র ত্রাণ দেবে— কোনোরকম স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে না এবং সরকার আশা করে পরিস্থিতি শান্ত হলে উদ্বাস্তুরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে। ড. মেঘনাথ সাহা সেদিন ক্ষোভ উগরে দিয়ে উদ্বাস্তুদের প্রতি নেহরুর দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অমানবিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসন নীতি ঘোষণা করলেও বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রের বৈমাত্রেয় আচরণের একটিই ব্যাখ্যা হতে পারে যে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বাঙ্গালিদের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতেন। কারণ ছেচল্লিশের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির দাঙ্গার মতো সংগঠিত নরসংহারের পর হিন্দুদের আবার পাকিস্তানে ফিরে যেতে বলার অর্থ যে ওদের আবার নেকড়ের মুখে ঠেলে দেওয়া। নেহরুর মতো বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের তা বোঝার ক্ষমতা নেই এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অবশেষে জওহরলাল নেহরু বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দেওয়ার পাকা পোক্ত ব্যবস্থা করলেন। ভারতমুখী উদ্বাস্তুর স্রোত বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘরে বসে দীর্ঘ আলোচনার পর এক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। ঠিক হলো ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যারা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে উভয় দেশ তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এই চুক্তিই নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে যে সমস্ত মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ, অসম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা সবাই আবার ভারতে ফিরে এসে বহাল তবিয়তে বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু পাকিস্তান ছেড়ে আসা হিন্দুরা খোলা আকাশের নীচে, রাস্তার ধারে, নদীর চরে, শ্বাপদ সংস্কুল এলাকায়, বসবাসের অযোগ্য ত্রাণ শিবিরে থেকে গেলেন কিন্তু পাকিস্তান নামক বধ্যভূমিতে কেউ ফিরে গেলেন না। জওহরলাল নেহরু এখানেই থামলেন না ১৯৫০ সালের ১৫ অক্টোবর পাশপোর্ট ব্যবস্থা চালু করলেন। ভবিষ্যতে আর যাওয়া যাবে না এই ভয়ে নতুন করে উদ্বাস্তুর স্রোত ভারতমুখী হতে লাগলো।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে ১৯৫০ সালের ১৯ এপ্রিল সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— '...আমাকে পদত্যাগ করতে যা বাধ্য করেছে তা হলো পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্তানি আচরণ। একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, বাঙ্গলার এই সমস্যা কোনো প্রাদেশিক সমস্যা নয়। এই সমস্যা থেকে কিছু সর্বভারতীয় বিষয় উঠে এসেছে, যার সমাধানের উপর গোটা দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সবই নির্ভর করছে। এ দেশের বেশিরভাগ মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ চেয়েছিলেন, যদিও একথা আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি যে একটি ছোট্ট অংশ যারা দেশপ্রেমিক এবং দেশের মঙ্গল কামনা করেন তারা চাননি এবং এজন্য তাদের কষ্ট স্বীকারও করতে হয়েছিল।

অপরপক্ষে হিন্দুরা কেউ দেশ ভাগ চাননি। যখন দেখা গেল দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী তখন আমি বাঙ্গলা ভাগ করার কাজে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলাম। এর কারণ তা না করলে গোটা বাঙ্গলা এবং সম্ভবত অসমও পকিস্তানে চলে যেতে। তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে আমি কেনোদিন দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পারি। (সেই সময়) আমি ও অন্য অনেকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আশ্বাস দিয়েছিলাম যে যদি পাকিস্তান সরকার তাদের উপর অত্যাচার করে, যদি তাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার না দেওয়া হয়, যদি তাদের জীবন ও মান-সম্মান বিপর্যস্ত হয় বা তাদের উপরে আক্রমণ হয় তাহলে স্বাধীন ভারত চুপ করে তা বসে দেখবে না— ভারতের সরকার জনগণ তাদের ব্যাপারে সাহসের সঙ্গে তৎপর হবে। গত আড়াই বছরে তারা যে যন্ত্রণা পেয়েছে তা যথেষ্ট ভয়াবহ এবং আজকে আমার স্বীকার না করে উপায় নেই যে তাদের যে আশ্বাস আমি দিয়েছিলাম আমি তা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রাখতে পারিনি এবং শুধু এই জন্যই বর্তমান সরকারে থাকবার কোনো নৈতিক অধিকার আমার আর নেই।

অতি সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্য তাদের গত আড়াই বছরের অত্যাচার ও অপমানকে ম্লান করে দিয়েছে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ভারতের কাছ থেকে সাহায্য পাবার যে অধিকার আছে তা শুধু মানবিক কারণে নয়। তারা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বৌদ্ধিক প্রগতির জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বার্থহীন ভাবে কাজ করে গেছেন। যে সমস্ত দেশনেতা আজ আমাদের মধ্যে নেই এবং যেসব যুবক হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে

আরোহণ করেছেন তাঁরা আজ সম্মিলিত কণ্ঠে ন্যায় বিচার চাইছেন।... পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিই হচ্ছে একটি ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি করা এবং সেখান থেকে সমস্ত হিন্দু ও শিখকে বিতাড়িত বা হত্যা করা এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। এই মূল নীতির জন্যই পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বিপদসঙ্কুল, বীভৎস ও সংক্ষিপ্ত'। ইতিহাস যেন আমরা ভুলে না যাই। ভুলে গেলে তা আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।... সমস্যাটা কিন্তু সাম্প্রদায়িক নয়, সমস্যাটা রাজনৈতিক। যে চুক্তি করা হলো তাতে ইসলামীয় রাষ্ট্রের মূলস্বরূপটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে...।'

১৯৫১ সালের ৩০ মার্চ সংসদে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সরকার পক্ষকে উদ্বাস্তুদের প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ কর ধার্য করার প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে বলেন, 'এই পুনর্বাসন একটি সাধারণ সামাজিক সমস্যা নয়, এটি একটি সাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যা নয়— এটি একটি বড়ো রাজনৈতিক সমস্যা, একটি মানবিক সমস্যা, এই সমস্যা সমাধান করা ভারত সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সংসদের সাব কমিটির সদস্য হিসেবে সুচেতা কৃপালনী দেশের পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করে প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝতে পারেন যে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে উদ্বাস্তুরা বাধ্য হচ্ছে পাকিস্তানে ফিরে যেতে। তিনি বলেন, 'সরকার শতমুখে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে উদ্বাস্তুরা পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি তারা কেন ফিরে যাচ্ছে— তারা ভালোবেসে পাকিস্তানি নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য ফিরে যাচ্ছে এমন নয়। উদ্বাস্তু শিবিরগুলির ভয়াবহ পরিস্থিতিজনিত হতাশা থেকে মুসলমান হয়েই তারা সেখানে বসবাস করবে এটা নিশ্চয় করেই তারা পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছে।' সুচেতা কৃপালিনী সেদিনের আবেগ ভরা ভাষণে বলেন, 'এই উদ্বাস্তুদের কখনই বিদেশি হিসেবে দেখা উচিত নয়। এদের এখানের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে স্থানীয় জনসাধারণ ও অর্থনীতির সঙ্গে একাত্ম করার কথা ভাবতে হবে। (Parliamentary Debates Volume IX).

বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের প্রতি জওহরলাল নেহরু ও সে সময়ের কংগ্রেস নেতৃত্বের সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার অভাব পরবর্তীকালের কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও দেখা যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের জন্মের পর আবার ভারতমুখী উদ্বাস্তুর ঢল নামে। পিতা জওহরলাল নেহরুর মতো ইন্দিরা গান্ধীরও বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার সময় বা সংবেদনশীলতা কোনোটাই ছিল না। ভারতীয় সেনার রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলেও পাকিস্তানের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া নোয়াখালি, ভৈরব ব্রীজের নরসংহার খ্যাত একটি মুসলমান সংখ্যাগুরু দেশের অমুসলমানরা কেমন থাকতে পারে ইন্দিরা গান্ধী সে সম্পর্কে ইতিহাস থেকেও শিক্ষা নিলেন না, চিন্তাও করলেন না, নবজাত বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য কোনোরকম রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও করলেন না। নেহরু লিয়াকত চুক্তির ২৪ বছর পর ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত হলো ইন্দিরা মুজিব চুক্তি। এই চুক্তিতেও আবার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাসের কথা উঠে এল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাতের গবেষণা বলছে ৩০ বছর পর বাংলাদেশে আর কোনো হিন্দু থাকবে না। তিন দশকের গবেষণার ফলাফল হিসেবে ড. বারাকাত দেখিয়েছেন বাংলাদেশের জন্মের আগে হিন্দুদের দেশত্যাগের হার ছিল প্রতিদিন ৭০৫ জন। ২০০১-২০১২ সালে এটা বেড়ে হয়েছে ৭৭৪ জন। স্পষ্টতই জওহরলাল নেহরুর ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন কন্যা ইন্দিরা গান্ধী।

ইন্দিরা মুজিব চুক্তির ১১ বছর পর ইন্দিরা পুত্র রাজীব গান্ধী ১৯৮৫ সালে অসমের আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে স্বাক্ষর করলেন উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙ্গালি বিরোধী অসম চুক্তি। এই চুক্তিতে বলা হলো ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্যে যারা অসমে প্রবেশ করেছে একমাত্র তারা অসমের বাসিন্দা হিসেবে ভারতের নাগরিকত্ব পাবে। এর পরে যারা এসেছে তারা বিদেশি বলে গণ্য হবে। অসমে সদ্য হওয়া এনআরসি-র জেরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তুর রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ার ঘটনাও কিন্তু রাজীব গান্ধী সম্পাদিত অসম চুক্তির ফসল। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী ভারতের এই তিন প্রধানমন্ত্রীই ধারাবাহিক ভাবে উদ্বাস্তু হিন্দুরা যাতে কোনো ভাবেই ভারতে অধিকার কায়েম করতে না পারে সেই লক্ষ্যে বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়ে গেছেন। অতি সম্প্রতি কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান সরকার একই পরিবারের ২১ জন পাকিস্তানি হিন্দু শরণার্থীকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়ার অর্থাৎ পাকিস্থানে ফেরত পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছিল। বিষয়টি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারে নজরে আসতেই গত ২৭ নভেম্বর জয়পুরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদের হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসা পত্র তুলে দেওয়া হয়। এর থেকে বলা যায় শুধু গান্ধী পরিবার নয়, উদ্বাস্তু হিন্দু বিরোধী পরম্পরা কংগ্রেস দলের ডিএনএতে।

স্বাধীনতার সাত দশক পর বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। এখন জওহরলাল নেহরু নেই, কিন্তু নেহরুর দল কংগ্রেস ও মমতার মতো ভাবশিষ্যরা আবার উঠে পড়ে লেগেছে উদ্বাস্তু হিন্দুদের ভাগ্য নির্ধারণ ঘটানোর জন্য।

বিশেষ অধিকার বাতিল করে কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা এবং উদ্বাস্তু হিন্দুদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে শহিদের মৃত্যুবরণ করা— এই সংকল্প নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভাবশিষ্যরা বিগত সাতদশক ধরে কঠোর তপস্যা করে এসেছে। ৩৭০ ধারা বাতিল, রামমন্দির নির্মাণের মতো দুটি অসাধ্য সাধনের মতো ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রমাণিত যে দীর্ঘ তপস্যার ফলে বলিয়ান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভাবশিষ্যরা এখন অপ্রতিরোধ্য।

এহেন অপ্রতিরোধ্য শক্তির সামনে উদ্বাস্তু হিন্দুদের ভাগ্য বিপর্যয় রুখে দেওয়ার লক্ষ্যে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের (ক্যাব) উদ্যোগের পথে কোনো বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ■

আধুনিক ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও ক্ষুধামুক্ত ভারত

পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়

নরেন্দ্র মোদীজী আধুনিক ভারত নির্মাণের এক বিস্ময়কর ও প্রভাবশালী সরকারের প্রধান। মাত্র ছয় বছর যাঁর কর্মকাল। তিনি এক দুর্বার সমাজ সংস্কারক। তিনি ১৩০ কোটি ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি বৈষম্যহীন সর্বভারতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী এক আপোশহীন রাজনৈতিক নেতা ও প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই তিনি গ্রহণ করেছেন অনেকগুলো যুগান্তকারী কর্মসূচি– পরিচ্ছন্ন ভারত, ডিজিটাল ভারত, মেক-ইন-ইন্ডিয়া, নারী শিক্ষা, গৃহহীনের জন্য গৃহ এবং অনুরূপ আরও অনেক। গত এক দশকে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১২০০ থেকে ২০০০ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্য ৩৩.৬৯ ভাগ থেকে নেমে দাড়িয়েছে ২১.৯ ভাগে। এইসকল সম্ভব হয়েছে দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কারণে যার মাস্টার মাইন্ড মোদী প্রশাসন। যে কাজ করে তার দায়িত্ব বাড়ে এটাই নিয়ম। মোদী সরকারের কাছে ভারতবাসীর চাওয়া-পাওয়া একটু বেশি। বিশেষ করে বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী যার মধ্যে নারীই বেশি। দেশে বর্তমানে প্রায় ২২ ভাগ অর্থাৎ ২৮ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। যার মধ্যে ৭০ ভাগই জনজাতি ও তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। বাকি ৩০ ভাগ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তবে পশ্চাৎপদ। ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়নের সীমারেখা টানা হয়েছে। ২৮ কোটি অবহেলিত মানুষকে পিছনে ফেলে টেকসই উন্নয়ন কি আদৌ সম্ভব? সহজ ও সত্য উত্তর 'না'। তাহলে করণীয়? একটি দারিদ্রমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার লাগসই কর্মসূচি রূপায়ণ। কী সেই কর্মসূচি যা মোদীজী নিতে পারেন?

মার্ক্সীয় অর্থতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট ছিল ভূমি, উৎপাদক ও উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে মালিকানাহীন এক সাম্যবাদী দর্শন। ব্যক্তি মালিকানা নয় রাষ্ট্রীয় মালিকানা। উৎপাদক শ্রেণী ও শ্রমজীবী তারা শ্রমের বিনিময়ে নিশ্চিত জীবন পাবে। রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করবে। শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় উক্ত পদ্ধতি বা দর্শনের প্রায়োগিক কোনও পরিবর্তন হয়নি। সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার কথা বলা হল। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে বিশ্বের আর্থসামাজিক বিবর্তনে মার্ক্সীয় দর্শনের তাত্ত্বিক মর্মার্থ গুরুত্ববহ হলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কার্যত তা অচল হয়ে গেছে। কিন্তু দারিদ্র্য রয়েছে—ধনী গরিব ব্যবধানও রয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শোষণ কমেছে। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে, কল্যাণ রাষ্ট্র সেগুলো পূরণের চেষ্টা করছে। সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে লক্ষ কোটি টাকার নানামুখী দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দারিদ্রের ভয়াবহতাও ক্রমশ কমে আসছে। তারপরও বিশ্বে ১০০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এই সেদিনও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে ধারণকারী দেশ ছিল ভারত, এখন নাইজেরিয়া।

অপ্রিয় হলেও সত্য সমাজতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্র এবং সরকারি ব্যবস্থা অনুরূপ দারিদ্র্য বিমোচনকে সুসংহত করতে পারেনি। বিকল্প হিসেবে শতাব্দীকাল আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল ক্ষুদ্র অর্থায়ন যা ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে পরিচিত। ক্ষুদ্র ঋণ একটি সামাজিক অর্থনৈতিক দাতব্য দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও কালের চক্রে সেটি আজ শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অপরিকল্পিত অর্থলগ্নি, উচ্চ সুদ ও নিষ্ঠুর কিস্তি আদায় পদ্ধতি দরিদ্র অসহায় মানুষকে আরও অসহায় করে তুলেছে। দরিদ্র মানুষের প্রথম চাহিদা ও তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার পেটের ক্ষুধা নিবারণ, তারপর চিকিৎসা, কাজেই যে অর্থই সে পায় তা বিনিয়োগ অন্তে লাভ খোঁজার সময় কোথায়। অর্থ ঋণ নিয়েই তাই চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফেরে অনাহারী সন্তান-সন্ততির জন্যে। অথবা স্ত্রী বা সন্তান অসুস্থ এবং হাসপাতালে তার চিকিৎসার খরচ জোগাতে। কাজেই বিনিয়োগ আর হয়ে ওঠে না। তখন নতুন কোনো এনজিও বা দাঁদন ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে নাম লেখায় এবং সেই টাকা এনে পূর্বের ঋণ শোধ করতে থাকে। বাস্তবে সে তখন দুটি ঋণের কিস্তির ফাঁদে পড়ে এবং দ্বৈত ঋণের জাঁতাকলে নিস্পেষিত হতে শুরু করে। দৈবক্রমে যদি কেউ ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করে কিছু আয় করে সেটিও সুদ ও আসলসহ ঋণদাতা ফিরিয়ে নেয়। তখন সে নতুন করে মূলধন বা পুঁজি খুঁজে ফেরে—শুরু হয় বিনিয়োগ অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্যে পুনঃ পদার্পণ। এভাবেই উচ্চ সুদ ও কিস্তি পরিশোধসহ গৃহিত ঋণের অর্থ আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগের সুযোগ না থাকা এবং অথবা সে সুযোগের ধারাবাহিকতার অনিশ্চয়তা দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পরিবর্তে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে নতুন নতুনভাবে গরিব মানুষেরা দারিদ্র্যে স্থায়ীভাবে নিপতিত হয়ে পড়ছে। দরিদ্র আরও বেশি দারিদ্র্যের ঘোর প্যাঁচে পড়ছে—এটাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

বর্তমান পরিবর্তিত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দরিদ্র মানুষের বেশি প্রয়োজন নিশ্চিত আয়। কারণ বাজারে পণ্যের অভাব নেই অভাব ক্রয় ক্ষমতার। কাজেই ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে গেলে আয় করা প্রয়োজন। সে আয় কারো দয়ায় নয়। নিজের শ্রম কাজে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে নিজস্ব আয় নিশ্চিত করা এবং সেটি নিরন্তর হওয়া আবশ্যক–তা হলেই গরিবের দারিদ্র্য দূর হবে। বিষয়টিকে মাথায় রেখেই অতি সম্প্রতি তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশ ক্ষুদ্র ঋণের দুর্বলতা ও অসংগতিকে দূর করে নতুনভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র অর্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সার্কভুক্ত প্রতিবেশি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল হিসেবে ক্ষুদ্র অর্থায়নের একটি অগ্রসর ও আধুনিক মডেল বাস্তবায়ন শুরু করেছে গত প্রায় এক দশক। আধুনিক ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব একটা চিন্তা উৎসারিত দর্শন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণ-বঞ্চনাহীন সমাজ গড়ার স্বপ্নকে সামনে রেখে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা অনেকগুলো দরিদ্রবান্ধব সামাজিক নিরাপত্তা

কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন যার মধ্যে এটি অন্যতম। দারিদ্র্যবিমোচনের এ মডেলটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের হাতে প্রণয়ন করেছেন। তাই কর্মসূচিটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নামে 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ--১' হিসেবে ব্রান্ডেড করা। এ মডেলের প্রায়োগিক রূপ হচ্ছে একটি বাড়ি একটি খামার (বর্তমানে আমার বাড়ি আমার খামার) প্রকল্প।

আমি ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৬ বছর একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। পদোন্নতি পেয়ে সচিব হিসেবে ওই প্রকল্পেরই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছি। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করেছে ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেখানে এনজিও এবং দাঁদন ব্যবসায়ীর সুদ ও কিস্তির জাঁতাকল থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। নিজেরাই সরকারি সহায়তায় অংশগ্রহণমূলক মূলধন গড়ে তুলছে। গড়ে ওঠা মূলধন প্রতিটি গ্রামে গরিব ব্যক্তি যাদের ৫০ শতকের কম জমি আছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে ৬০ জনের একটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করেছে। যাবতীয় অর্থ উক্ত সমিতির ব্যাংকে জমা থাকছে। সদস্যগণ সাপ্তাহিক উঠান বৈঠকে বসে নিজেরা ঠিক করছে কে কোন বিষয়ে বিনিয়োগ করবে। গ্রামীণ জনপদে সাধারণত কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধক কাজেই তারা বিনিয়োগ করছে কারণ যিনি যে ধরনের কাজে পারদর্শী বা অভ্যস্ত তিনি সেটাই করবেন। কেউ কেউ অকৃষি বিনিয়োগ যেমন ছোট মুদি দোকান, মিনি কম্পিউটার ও মোবাইল সেন্টার এবং হকারির মতো কাজও করছেন। বিনিয়োগ শেষে গৃহীত অর্থ নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জসহ সুবিধামতো সময়ে নিজেদের সমিতির অ্যাকাউন্টে জমা করছেন। এভাবে নিজেদের তহবিল বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাপ্তাহিক উঠান বৈঠকে বসে নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দমতো কাজে অর্থ বিনিয়োগ, বিনিয়োগ শেষে নিজেদের অ্যাকাউন্টে সার্ভিস চার্জসহ জমা এবং পুনরায় বিনিয়োগ এবং পুনরায় জমা এভাবে স্থায়ী তহবিল ব্যবহার, নিরন্তর বিনিয়োগ, নিরন্তর আয় ও ধারাবাহিক দারিদ্র্যবিমোচন প্রকৃতই দারিদ্র্যবিমোচনে এক অনবদ্য ও টেকসই মডেলের জন্ম দিয়েছে। টেকসই মডেলটি হচ্ছে—the fund is mobilized by the poor, utilized by the poor and also managed by the poor। ক্ষুদ্র ঋণের বাইরে এই অগ্রসরমান আধুনিক মডেলটির সুবিধাগুলো হচ্ছেঃ (১) ক্ষুদ্র ঋণে তহবিলে বা পুঁজিতে গরিবের মালিকানা থাকে না যেটা এ মডেলে থাকে। (২) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং তহবিল পাবার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণে নিশ্চয়তা নেই যেটা এখানে আছে কারণ অর্থের মালিকানা তাদের। (৩) ক্ষুদ্র ঋণে উচ্চ সুদ দিতে হয় এবং সুদাসল ঋণদাতা নিয়ে যায় কিন্তু এ মডেলে সুদ নেই ন্যূনতম একটি সার্ভিস চার্জ আছে সেটিও আসলের সাথে গরিবের সমিতির অ্যাকাউন্টে জমা হয় এবং বছর শেষে নিজেরাই লভ্যাংশ বণ্টন করে নিতে পারে বা তহবিল বৃদ্ধির জন্য রেখে দিতে পারে। (৪) সার্ভিস চার্জের একটি অংশ সদস্যদের আপৎকালীন ফান্ড হিসেবে থাকে যা কারো দুর্ঘটনা বা দুরারোগ্য ব্যাধি বা কন্যাদায় বা শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সুযোগ থাকে যা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থায় নেই। (৫) এ মডেলে অনলাইনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রামে বসেই যাতীয় আর্থিক লেন-দেন সম্পন্ন হয় বলে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। চুরি বা দুর্নীতির সুযোগ থাকে না। (৬) সর্বোপরি এটি স্থায়ী তহবিল যা নিজেরাই ম্যানেজ করে এবং পুরুষানুক্রমে এ অর্থ রিভলবিং (ঘূর্ণায়মান) ফান্ড হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে অর্থাৎ দরিদ্র কোনো নাগরিককে পুরুষানুক্রমে অর্থের জন্য কারো কাছে হাত পাততে হবে না এবং কিস্তির জ্বালায় জ্বলতে হবে না। এটি টেকসই বিনিয়োগ ও নিরন্তর আয় নিশ্চিত করে যা একজন গরিবের বাজার অধিগম্যতাকে নির্বিঘ্ন করে তোলে এবং টেকসই দারিদ্র্যবিমোচনের মাধ্যমে একটি দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গঠনকে ত্বরান্বিত করে।

আমার কর্মকালীন সময়ের অর্জিত সাফল্য ও অভিজ্ঞতার কিছু তথ্য তুলে ধরে বিষয়টি স্পষ্ট করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। বাংলাদেশের মোট ৬৪টি জেলায় ৪,৫০৩টি ইউনিয়নে ৪০,৫২৭ টি ওয়ার্ড আছে। যার প্রতিটিতে ৬০ জন দরিদ্র পরিবার প্রধানকে নিয়ে ১টি করে মোট ৪০,৫০৩টি সমিতি গঠন করা হয় যেখানে মোট উপকৃত পরিবার ছিল ২৩ লক্ষ অর্থাৎ ১ কোটি ২০ লাখ লোক। তাদের গড়ে ওঠা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩, ৩৯৫ কোটি টাকা যার মধ্যে গরিব সদস্যদের সঞ্চয় ছিল ১০৭০ কোটি টাকা এবং সরকার অনুদান দেয় ২১৪০ কোটি টাকা। বাকিটা তাদের সার্ভিস চার্জ এবং ব্যাংক সুদ। এসময়ে তারা ৪৫ লক্ষ পারিবারিক খামার গড়ে তোলে।

অন্তর্বর্তীকালীন এক সমীক্ষায় দেখা যায় বছরে তাদের মাথাপিছু আয় বাড়ে ১০ হাজার টাকা। দারিদ্র্য ৩০ ভাগ থেকে ১৭ ভাগে নেমে আসে। মধ্যম আয়ের পরিবারের সংখ্যাও ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এ সাফল্যের উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের বাকি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এ মডেলে সম্পৃক্ত করার নির্দেশ দেন এবং তদানুযায়ী দেশের ৩ কোটি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্যবিমোচনে ২০১৬ সালে ৮, ০০০ কোটি টাকার বর্ধিত প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। দ্বিতীয়ত প্রকল্প শেষ হলেও দারিদ্রবিমোচনের এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংকও সৃষ্টি করেছেন যার মালিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

নিজের ৭ বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা থেকে আজকের এ লেখা। আমি বিশ্বাস করি এ মডেলের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি স্বাবলম্বী ও স্থায়ী দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গঠন করা সম্ভব। শুধু একটি দেশ নয় এ মডেলের মাধ্যমে বিশ্বের ১০০ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলাও সম্ভব। তবে একটি কথা এটি কোনো গাণিতিক সূত্র নয় যে এই মডেল হুবহু অন্যদেশে প্রযোজ্য হবে। মডেলটি সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, জলবায়ু, জীবন প্রণালী, খাদ্যাভ্যাস ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপকতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সংযোজিত ও বিয়োজিত করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। আমার মতে ভারতে এ কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপক যৌক্তিকতা রয়েছে, কারণ এখনো সেখানে ২৮ কোটি দরিদ্র মানুষ উন্নত জীবনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত বিপ্লবী উদ্যোগগুলোর সাথে এটি নতুন একটি উদ্যোগ হতে পারে যার গুরুত্ব অপরিসীম বলে আমি মনে করি। ■

সদ্ভাবনার পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের বড়ো রায়

গৌতম কুমার মণ্ডল

দশকের পর দশক ধরে চলা ভারতীয় উপমহাদেশের সবথেকে জটিল ও রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর একটি আইনি সমস্যার সমাধান হলো গত ৯ নভেম্বর। এ যেন আর এক রকমের নাইন ইলেভেন। দিনটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই দিন দেশের সর্বোচ্চ আদালত অযোধ্যার বিবাদিত ২.৭৭ একর জমিতে রামলালা বিরাজমানের দাবিকে স্বীকৃতি দিলেন এবং সেখানে রামমন্দির নির্মাণের পথে সব রকম বাধা সরিয়ে দিলেন। দেশের মুসলমান সমাজের খানিকটা প্রতিনিধিত্ব করছিল যে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড তাদেরও নিরাশ করেনি সর্বোচ্চ আদালত। অযোধ্যাতেই ৫ একর জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে কেন্দ্র বা উত্তরপ্রদেশ সরকারকে যেখানে তাঁরা মসজিদ বানাবেন। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে এই রায় দিয়ে দেশের সবথেকে জটিল একটি সমস্যার সমাধান করে নিলেন। আমরা এই দেশের সচেতন নাগরিকেরা নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করতে পারি শুধু এই কারণেই যে, আমরা এই রায় জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলাম। হিন্দুদের মধ্যে রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের জন্য লড়াই করেছেন এরকম বহু মানুষের ইতিমধ্যেই মৃত্যু ঘটেছে। আমরা আজ যেন তাঁদের কথা ভুলে না যাই।

সারা ভারতেরই শুধু নয়, সারা বিশ্বের একশো কোটির বেশি হিন্দু জনসমষ্টির কয়েকশো বছরের লালিত স্বপ্ন এতদিনে সাকার হতে চলেছে। এই স্বপ্ন তাঁরা দেখেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। হতাশায় নিরুদ্যমে ভেঙে না পড়ে হিন্দু সমাজ তার স্বপ্নকে ধরে রেখেছিল। স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে বলে হিন্দুমন আজ খুশি। দীর্ঘদিনের একটি অমীমাংসিত বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান করে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-সহ আরও চার ন্যায়াধীশ। এই বিচার প্রক্রিয়াও চলেছে অনেকদিন ধরে। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে অনেকে চেয়েছিলেন বিষয়টির প্রতিদিন শুনানি হোক এবং নির্বাচনের আগেই রায় চলে আসুক। প্রধান বিচারপতির কাছে এ মর্মে আবেদনও করা হয়। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সে আবেদন শোনেননি। তিনি জানিয়েছিলেন বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে আদালতের নিয়ম ও রুটিন মেনেই; কোনো তাড়াহুড়ো করে নয়। কিন্তু তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন তাঁর অবসর গ্রহণের পূর্বেই এই বিষয়টির তিনি সমাধান করে দিয়ে যাবেন।

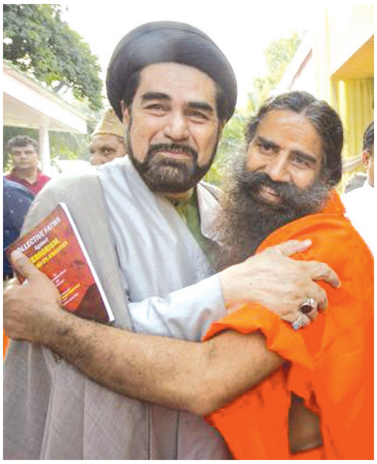

আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে আদালতের বাইরে যাতে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয় তার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এফ এম আই কলিফুল্লার নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গড়ে দেওয়া হয়। কমিটির বাকি দুই সদস্য ছিলেন শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর ও বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীরাম পাঞ্চু। কমিটিকে প্রথমে আট সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। পরে সময় বাড়ানো হয়। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন। তাই আদালতকেই দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসতে হয়। টানা চল্লিশদিন শুনানি চলে। সব পক্ষের সব মত শোনা হয়। দলিল দস্তাবেজ দেখা হয়। খুঁটিয়ে পড়া হয় ঐতিহাসিক উপাদান, ভ্রমণকাহিনি, গেজেটিয়ার্স, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকদেবজী বাবরি মসজিদ গড়ে ওঠার অনেক আগেই রামজন্মভূমি দর্শন করেছিলেন এই তথ্যও বিচারকদের নিজেদের রায় দানের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগে। রায়ে এ বিষয়টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে— "The visit of Guru Nanak Devji in 1510-11 AD and to have darshan of Janmabhumi of Lord Ram do support the faith and beliefs of the Hindus."

অবশেষে শুনানি শেষ হয়। তারপর কয়েকদিনের বিরতি। রাতদিন প্রায় এক করে ১০৪৫ পৃষ্ঠার রায় তৈরি করেন বিচারপতিগণ। অবসান হয় সব দ্বন্দ্ব আর বিরোধের। রায় বেরোনোর পর গোটা দেশ জুড়ে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা খুশি ও আনন্দের ভাব দেখা গেছে। কিন্তু এই খুশি প্রকাশ করার বা উচ্ছ্বাস দেখানোর সেরকম কোনো উপায় ছিল না। কারণ এই বিষয়টি ছিল স্পর্শকাতর। উচ্ছ্বাস দেখানোর বিষয়ে প্রশাসনের নানারকম বিধিনিষেধ ছিল। সামাজিক গণমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে মাতামাতি করার কোনো উপায় ছিল না। খুব একটা মাতামাতি কেউ করেওনি। এতবড়ো রায়ের পরেই প্রয়োজনীয় সংযম আমজনতা দেখাতে পেরেছিল।

সবথেকে বড়ো কথা হলো, দেশের বৃহত্তর মুসলমান সমাজও এই রায়কে মেনে নিয়েছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন মুসলমান সংগঠন অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য অর্থসাহায্যের প্রস্তাব দিচ্ছেন। এত দিনের একটা বিরোধ যা হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে গলার কাঁটার মতো আটকে ছিল তার নিরসন হয়ে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন মুসলমান ধর্মের সাধারণ মানুষ। তাঁরা ভেবেছেন এবার সম্প্রীতির বন্ধনের মাঝখানে আর কোনো বাধা রইল না। তাই মৌলানা ইমরান হাসান সিদ্দিকি বা মৌলানা সুফিয়ানের মতো ধর্মগুরু কিংবা খালিদ রশিদের মতো আইনজীবী ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সদস্যরাও এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা ভেবেছেন নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিল এই রায়। নতুন ভারতের নতুন প্রজন্ম মন্দির মসজিদের মধ্যে আর জড়িয়ে থাকতে চায় না। মন্দির মসজিদের বাইরে মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ এরপর সচেতন ও শিক্ষিত হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারবে বলেও এই

রায়ের জন্য তারা আনন্দিত।

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও বিষাদ খুঁজে বেড়িয়েছেন অনেকেই। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়লে, সব রকম বিভেদ ভুলে গিয়ে দেশের কথা ভাবলে যাদের রাজনীতির কারবার বন্ধ হয়ে যাবে সে রকম দু'য়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও তাদের দল এই দেশব্যাপী সন্তুষ্টির মধ্যে চোনা খুঁজে বেড়ালেন। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওবেসির কথা। তিনি এখন ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধি কিংবা মসিহা হয়ে উঠতে চাইছেন। তাঁর দল এ আই এম আই এম রাজনীতি করে হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে পুঁজি করে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়লে, ধর্মীয় বিভেদ ভুলে মুসলমানরা আধুনিক উদারনৈতিক চেতনার কথা ভাবলে আবেসির রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তিনি বিরোধ জিইয়ে রাখতে চান। অযোধ্যার রায় বেরোনোর পর সবাই যখন রায়কে স্বাগত জানাচ্ছেন তখন অবেসি প্রমাদ গুনলেন। একটু পরেই তাঁর টুইট এল 'আই ওয়ান্ট মাই মসজিদ ব্যাক'। মুসলমানদের হয়ে গলা ফাটিয়ে বাজার গরম করার চেষ্টা করে চলেছেন ওবেসি সাহেব। আশা করি এরকম রাজনীতি থেকে মুসলমান সমাজ সচেতন থাকবেন।

ওবেসি হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে নিয়েই রাজনীতি করেন, তাই বিরোধকে তিনি প্রকাশ্যেই বজায় রাখতে চান। তাঁর উদ্দেশ্য জলের মতো পরিষ্কার ও তা বোঝা যায়। কিন্তু যাঁরা নিজেদের সেকুলার বলেন তাঁরাও এই রায়ে খুশি নন। যেমন সিপিআই (এম)। এদের সাধারণ সম্পাদক আগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিচার চান। এই রায়কে 'প্রশ্নাতীত নয়' বলে তাঁর মনে হয়েছে। তবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েও সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। আপাতত এই উদার মনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে ধন্যবাদ। তবে আমাদের রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই যুগান্তকারী রায় সম্পর্কে কোনো কথা বলেনি। মুখ্যমন্ত্রী নীরবতার আশ্রয় নিয়েছেন। একটি কবিতা লিখে বলতে চেয়েছেন অনেক সময় নীরবতা বহু কথা বলে। মানুষ তাঁদের নীরবতার মর্ম বোঝেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও স্বাগত জানানোর সাহস নেই যাদের তারা তাদের রাজনীতিকে কোথায় বন্ধক রেখেছেন তা সবাই জানেন। এভাবে কি বেশিদূর যাওয়া সম্ভব? সময়ই বলবে। সব থেকে বড়ো কথা হলো, এই রায়ের পর হিন্দু মুসলমান বিরোধের অবসান ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। ধর্ম বা মন্দির মসজিদ যে আধুনিক ভারতের উদার ও মুক্ত মনের নাগরিকদের কাছে আর রাজনীতির বিষয় হয়ে থাকবে না, এই রায় সেই ভাবনার পথও প্রশস্ত করল। ধর্মচর্চা নিজস্ব অনুভবের বিষয়, নিজস্ব ভালো লাগার আর ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের বিষয়। মানুষ ধর্মচর্চা করে শান্তি পায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ধর্মকে নিয়ে বিশ্ব জুড়ে হানাহানির যেন শেষ নেই। এই পটভূমিতে একবিংশ শতাব্দীর নতুন ভারতের নাগরিকদের কাছে অযোধ্যার রায় প্রাণের আরাম ও শান্তি এনে দিয়েছে। সব বিরোধের অবসান হয়েছে। অযোধ্যার সেই পুরোনো জায়গায় রামমন্দির নির্মাণ হবে। সারা দেশ থেকে হিন্দুরা এমনকী অন্য ধর্মের বহু মানুষও অসবেন। ভগবান রামের মূর্তি দর্শন করবেন। পুজো দেবেন। আরতি করবেন। আর হয়তো খানিক দূরে এই অযোধ্যাতেই গড়ে উঠবে মসজিদ। সারা দেশের মানুষ সেখানেও আসবেন। সেখানে আজানের সুর শোনা যাবে। আরতি আর আজানের সুরে সব বিভেদের ঊর্ধ্বে জেগে উঠবে আগামীদিনের নতুন ভারত। ■

With Best Compliments From :-

SANTOSH KUMAR SINGHANIA

M: 9830144328

14/27B, Dr. H. K. Chatterjee Lane

Ghusuri, Howrah

inside of Victoria Steel Market

With Best Compliments From :-

ULTRAMINE PIPETECH PRIVATE LIMITED

ইজরায়েলি মডেল অনুসরণ করলে উপকৃত হবেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিক্ষোভে রয়েছে এই ছোট্ট শিশুটিও।

ইজরায়েল ১৯৬৭ সালে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং পূর্ব জেরুজালেম দখলের পর থেকে প্রায় ১৪০টি বসতি গড়ে তুলেছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী জনবসতিগুলি ব্যাপকভাবে অবৈধ বলে বিবেচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি বলেছে যে ইজরায়েলের বসতিগুলি অবৈধ বলে বিশ্বাস করে না তারা। ২০১৯-এর ২৯ নভেম্বর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সচিব বলেছেন যে গাজা বা ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ভূখণ্ডে ইজরায়েলিদের বসতি স্থাপন আর অবৈধ নয়। এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সচিব মাইক পম্পেইও বলেছেন যে অসামরিক বসতিস্থাপন সম্পর্কিত ইজরায়েলি আদালতের রায় সেখানকার মাটির সঙ্গে জড়িত সুনির্দিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে দেওয়া হয়েছে— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাই তাকে স্বীকৃতি দেয়। পিটিআই ওয়াশিংটন এখবর জানাচ্ছে।

বড়োসড়ো নীতিগত পরিবর্তন করে ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে প্যালেস্টাইন এলাকায় ইজারায়েলি বসতিস্থাপন অবৈধ বলে তারা আর মনে করে না। তারা জোর দিয়ে বলেছে যে, 'এইরূপ বসতিস্থাপন আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ' আগেকার এই যুক্তি শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আদৌ সাহায্য করেনি।

সুতরাং আমেরিকা সরকার অসামরিক বসতিস্থাপনের আইনগত অবস্থানের উপর কোনো মতামত দিচ্ছে না। সোমবার পররাষ্ট্র দপ্তরের 'ফোগি বটম' সদর দপ্তরে পম্পেইও সাংবাদিকদের বলেন, ''ট্রাম্প প্রশাসন ইজরায়েলি জনবসতিগুলির বিষয়ে ওবামা প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টাতে চায়।''

ইজরায়েলি আদালত বসতিস্থাপনের ক্রিয়াকলাপকে চ্যালেঞ্জ করার এবং এর সঙ্গে যুক্ত মানবিক দিকগুলি মূল্যায়ন করার সুযোগ দিয়েছে। ইজরায়েলি আদালত নির্দিষ্ট কিছু বসতিস্থাপন কার্যক্রমের বৈধতাকে মেনে নিয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বাকিগুলো আইনগতভাবে মেনে নেওয়া যায় না। পম্পেইও বলেছেন, ''আইনি বিতর্কে সমস্ত পক্ষের মতামত বিচার করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে যে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইজরায়েলি অসামরিক বসতিস্থাপন করা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।''

''দ্বিতীয়ত, আমরা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের স্থিতির চূড়ান্ত সমাধান বা পক্ষপাতপূর্ণ বিচার করছি না। এটা ইজরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আলোচনার বিষয়। আন্তর্জাতিক আইন কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না বা আলোচনায় কোনও আইনগত বাধা সৃষ্টি করে না''।

ইজরায়েলি বোমায় বিধ্বস্ত জঙ্গি শিবির।

''তৃতীয়ত, যে ইজায়েলি জনবসতিগুলি আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলো আমরা কখনো স্বীকার করব না, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে অসামরিক বসতিস্থাপনের মতো যেগুলো সম্পর্কে ইতিহাস ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলোই স্বীকার করব। আমাদের আজকের সিদ্ধান্ত আগ বাড়িয়ে নেওয়া নয় বা বিশ্বের অন্য কোনও অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কিত আইনি সিদ্ধান্ত নয়''

বলেছেন শীর্ষ আমেরিকান কূটনীতিক।

পম্পেইও বলেছেন, ''এবং অবশেষে 'অসামরিক বসতি স্থাপনের কথা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়' একথা কোনো কাজে দেয়নি, কারণ তাতে শান্তিপ্রক্রিয়া এগোয়নি"।

তিনি বলেছেন যে কঠিন সত্যিটা এই যে আদালতে এই দ্বন্দ্বের সমাধান কখনই হবে না এবং আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে কে ঠিক ও কে ভুল তাই নিয়ে তর্ক করলে শান্তি আসবে না। এটি একটি জটিল রাজনৈতিক সমস্যা যা কেবল ইজরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। পম্পেইও আরো বলেছেন যে তাঁর দেশ, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে এই ইজরায়েলিয় বসতিগুলির অবস্থানের বিষয়টি আলোচনা দ্বারা চূড়ান্ত সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট দুই দেশকে উৎসাহিত করে। আমেরিকা শান্তির খাতিরে সহায়তা দেওয়ার জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই লক্ষ্যে সহায়তা করার জন্য সব কিছু করবে।

প্রাক-ট্রাম্প প্রশাসনের মত :

পম্পেইওর মতে, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে বসতিস্থাপন কার্যকলাপ সম্পর্কে কয়েক দশক ধরে জারি করা প্রকাশ্য মার্কিন বিবৃতি বড়োই বেখাপ্পা। যেমন ১৯৭৮ সালে, জিমি কার্ট ার প্রশাসন স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ইজারায়েলের অসামরিক বসতি স্থাপনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে মাঝখানে ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হননি এবং বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে জনবসতিগুলি মূলত অবৈধ ছিল। কিন্তু রেগান-পরবর্তী প্রশাসনগুলি আবার স্বীকার করেছে যে এই অবাধে বসতিস্থাপন কার্যক্রম শান্তির পথে বাধা হতে পারে, কিন্তু তারা বিচক্ষণ দূরদর্শিতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে আইনি লড়াইতে শান্তিস্থাপন এগোয়নি।

ওবামার পূর্বের কয়েক দশক ধরে তার আগেকার আমেরিকান সরকারগুলো গা বাঁচিয়ে চলা দু'মুখো নীতি নিয়েছিল; ইজরায়েলি জনবসতিগুলি অবৈধ, তারা জোর দিয়ে প্রকাশ্যে এই বিবৃতি দিয়েছিল। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে, পূর্ববর্তী প্রশাসনের একেবারে শেষে, তৎকালীন ওবামা প্রশাসন সেই নীতির পরিবর্তন করেছিল।

পম্পেইও জানিয়েছেন ''আইনানুগ বিতর্কের সবদিক সাবধানতার সঙ্গে অধ্যয়ন করার পরে, ট্রাম্প প্রশাসন রাষ্ট্রপতি রেগানের পূর্বোক্ত মতের সঙ্গে একমত হয়''। ''আজকের এই সিদ্ধান্ত ওবামা প্রশাসন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৩৩৪ প্রস্তাবের অপমানজনক উত্তরাধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও একটি পদক্ষেপ নিয়েছে" বলে সিনেটর টেড ক্রুজ বলেছেন।

ডেমোক্র্যাটদের প্রতিক্রিয়া : আধ ডজনেরও বেশি ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসপন্থী একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেছে যে বিতর্কিত অঞ্চলে নির্মিত ইজরায়েলি জনবসতিগুলিকে আর আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী বলে বিবেচনা করবে না বলে ঘোষণা করে ট্রাম্প প্রশাসন একাই কয়েক দশকব্যাপী চলা মার্কিন নীতি উল্লঙ্ঘন করেছেন এবং আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করেছেন, এতে অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে ইজরায়েলি বসতিকে কার্যত বৈধ করেছে।

মার্কিন দূতাবাসকে জেরুজালেমে সরিয়ে নেওয়ার, সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিলিস্তিনের অফিস ও জেরুজালেমে মার্কিন কনস্যুলেট বন্ধ করে দেওয়া এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজায় সহায়তা কমানোর ব্যবস্থা করা— এসব এই ছবি তুলে ধরে যে ট্রাম্প প্রশাসন মধ্য প্রাচ্যের শান্তি ও সুরক্ষার লেশ মাত্র আশা শেষ করে দিয়েছে।

''এটা পরিষ্কার যে প্রশাসনের ইজরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদেরকে সরল বিশ্বাসে একত্রিত করার কোনও পরিকল্পনা নেই'', ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস সদস্যরা হলেন ডেভিড প্রাইস, জান স্কাওকস্কি, জন ইয়ারমুথ, জেরি কনলি, বারবারা লি, পিটার ওয়েলস, অ্যালান লোয়েনথাল, লয়েড ডগেট এবং আল ব্লুমেনার।

কাশ্মীরি পণ্ডিত :

নিউইয়র্কের ভারতের কনসাল জেনারেল সন্দীপ চক্রবর্তী বলেছেন যে, ১৯৭০-এর দশকে হিংসার কারণে উপত্যকা ছেড়ে আসা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনে ইজরায়েলি মডেল অনুসরণ করতে পারে ভারত। একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ভারতীয় কূটনীতিক বলেছেন যে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা শীঘ্রই উপত্যকায় ফিরে যেতে পারেন কারণ ''ইজরায়েলি জনগণ যদি তা করতে পারে তবে আমরাও এটা করতে পারি।"

''আমি বিশ্বাস করি...আপনার জীবদ্দশায় আপনি ফিরে যেতে পারবেন...এবং আপনি সুরক্ষা পাবেন...কারণ ইতিমধ্যে বিশ্বে আমাদের একটি মডেল রয়েছে।"

''...মধ্যপ্রাচ্যে এটা হয়েছে, ইজরায়েলি জনগণ যদি এটি করতে পারে তবে...আমরাও করতে পারি...তারা তাদের সংস্কৃতিকে দেশের বাইরে ২০০০ বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং তারা ফিরে গেছে। আমি মনে করি আমাদের সকলকে কাশ্মীরি সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কাশ্মীরি সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি। কাশ্মীর ছাড়া আমরা কেউই ভারতবর্ষের কথা ভাবতে পারি না। আমার জীবদ্দশায় আমরা আমাদের জমি ফিরে পাব, আমাদের জনগণকে কিছুটা সময় পিছনে যেতে হবে, সরকার যা করেছে তা করেছে।"

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন--- ''এটা ভারত সরকারের আরএসএসের মতাদর্শের ফ্যাসিবাদী মানসিকতা দেখায়। তারা ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের অবরোধ অব্যাহত রেখেছে, কাশ্মীরিদের মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন করেছে এবং শক্তিধর দেশগুলি তাদের ব্যবসায়ের স্বার্থের জন্য নীরব রয়েছে", এই বিতর্কের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সন্দীপ চক্রবর্তী বলেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এবং ইজরায়েলি ইস্যুতে অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে। শ্রী চক্রবর্তী শুধু বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ইহুদিদের তাদের আদি বাসস্থান গাজা ও পূর্ব জেরুজালেম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কিন্তু তারা বাইরে থেকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের জমি পুনরুদ্ধার করেছে, কাশ্মীরি হিন্দুরাও যেন তাই করে। ■

চিঠিপত্র

দেশে এন আর সি বিশেষ প্রয়োজন

গত ৩০ নভেম্বর ২০১৯-এর খবরে জানা গেল এন আর সি-র আতঙ্কে দেশে ফেরার পথে ১৩ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তারা স্বীকার করেছেন পাঁচ বছর আগে চোরা পথে ভারতে ঢুকে প্রথমে মুম্বই ও পরে দক্ষিণভারতের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি আবাসনের কাজ করছিলেন। এদের মধ্যে তিন শিশু ও পাঁচ মহিলা। তার আগে ১৫ নভেম্বরের খবরে লেখা হয়েছে এন আর সি-র আতঙ্কে ভারত ছাড়তে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ে সাত মহিলা ও চার শিশু-সহ ৩৬ জন। চোরাপথে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকা থেকে ৩০ জন, বনগাঁ থানা এলাকা থেকে ৪ জন ও গাইঘাটা থানা এলাকা থেকে ২ জন ধরা পড়েছে। তারা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে— চোরাপথে ভারতে ঢুকে তিন বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করছিল। এন আর সি-র আতঙ্কে ফিরে যাচ্ছে তারা।

এছাড়াও নভেম্বরের প্রথমার্ধের মধ্যেই তিনশোর উপর এরকম অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকরীরা ফিরে গেছেন এবং তারা প্রত্যেকেই মুসলমান। এন আর সি নিয়ে কড়া প্রচারের জন্যই এরা স্বদেশে ফিরে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শত্রু ধর্মনিরপেক্ষ নামক রাজনীতিকদের সাহায্যে ভারতে থেকে এরা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড বাগিয়ে নিয়ে জনসংখ্যার বোঝা বাড়িয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার ডেমোগ্রাফি বদলে ফেলত। এই অবৈধ অনুপ্রবেশ একদিকে যেমন জনবিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গি কার্যকলাপ, জেহাদ ও অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। সংসদে এনিয়ে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই স্বীকার করেছে ও আলোচনা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এক কোটির বেশি অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। কিন্তু তাদের কীভাবে চিহ্নিতকরণ করে ফেরত পাঠানো হবে তার উপায় নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে কেবলমাত্র হিন্দুদের অসুবিধা হচ্ছে না, স্থানীয় মুসলিম অধিবাসী যাঁরা এদেশে দেশভাগের আগে থেকে বসবাস করছেন তাঁদের খাবারেও এসব অনুপ্রবেশকারীরা ভাগ বসাচ্ছে। আর এস এস দীর্ঘদিন ধরেই এই সব অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকরীদের কথা বলে আসছে।

এইসব অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসীরাও এসে এরাজ্যে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে নাশকতার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি খাগড়গড়, কালিয়াচক, ক্যানিং, হাওড়া ইত্যাদি কাণ্ডে। তবুও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির এবং বুদ্ধি বেচনেওয়ালাদের হুঁশ ফেরেনি। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট মিলে সমগ্র বাঙ্গলাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছিল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সে প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়ে জিন্নার হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে নেন। তার ফলে পূর্বপাকিস্তান থেকে এবং বর্তমান বাংলদেশ থেকে যে সমস্ত হিন্দুরা কচুকাটা হওয়ার ভয়ে রাতের অন্ধকরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে পালিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদেরই কোনো কোনো পুত্র-কন্যা ধর্মনিরপেক্ষতার ভান করে পশ্চিমবঙ্গকে পুনরায় ভাগ করার নেশায় মেতে উঠেছেন।

এদিকে বর্তমান শাসকদলের প্রধান তো আদাজল খেয়ে এন আর সি-র বিরোধিতায় নেমেছেন। তাঁর কথা— পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি করতে দেব না। এখানে একজনও অনুপ্রবেশকারী নেই। কাউকেই এখান থেকে তাড়াতে দেব না, বাঙ্গলায় যারা আছে তারা প্রত্যেকেই এদেশের নাগরিক। তাঁর এই কথার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে যে সমস্ত মুসলমানরা নিজ দেশে ফিরে যাবার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এবং নিজেরা স্বীকার করেছে তারা বাংলাদেশি নাগরিক, তারা কি পুলিশের কাছে মিথ্যা বলছে? এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। তাই বলাই যায় দেশে এন আর সি-র বিশেষ প্রয়োজন।

—**সৎকারী শর্মা**, মালদহ।

ধর্ষকের সাজা হোক জীবন্ত সমাধি

প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির মৃত্যু সারাদেশকে স্তম্ভিত করেছে। কীভাবে তার গাড়ির চাকা পাংচার করে রাতের অন্ধকারে সাহয্যের আশ্বাস দিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ এবং শেষে প্রমাণ লোপাটের জন্য পুড়িয়ে মারা। এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য সারাদেশের সুস্থ মানুষের মনকে আবারো নাড়িয়ে দিল। মহম্মদ পাশার মতো নৃশংস ব্যক্তির উদ্দেশ্যই হিন্দুর সুন্দরী মেয়ে এবং বউয়ের আস্বাদন লাভ করা। যেমন ছিল মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা অহিন্দু রাজা বাদশারা। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চলে আসা রীতির ২০০০ সালের পরেও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। চিরদিন হিন্দুর মেয়ে বউরা হয়েছে এই নরপিশাচদের লালসার শিকার। জানি না এর পরিসমাপ্তি ঘটতে আর কতটা সময় দিতে হবে। এদের হাত থেকে বাঁচতে আমাদের মা-বোনেরা জহরব্রত পালন করে তাদের সতীত্ব রক্ষা করেছে। সে ইতিাস সবারই দৃষ্টি দর্পণে আঁকা আছে। এক হাজার বছর পরেও বলিদান করতে হচ্ছে নিরীহ ভারতবাসীদের। না জানি কত যে জয়চাঁদ লুকিয়ে রয়েছে ভারতের আনাচে-কানাচে। তার হিসাব মিলাতে জানি না আর কতদিন লাগবে। প্রিয়াঙ্কার বাবা মা আর ভারতের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ইচ্ছা এইসব ধর্ষকদের রাস্তায় পুড়িয়ে মারা। এতেও যেন মনের আকুতি মেটে না। ধর্ষককে দেওয়া হোক জীবন্ত সমাধি, সেটা দেখে বাকি ধর্ষকের টনক নড়বে। এতে ধর্ষণ তো দূরে থাক সুন্দরী মেয়েদের দিকে তকানোর সাহস কেউ করবেন না। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে কত বিলই তো পাস হচ্ছে। এই ধর্ষকের নির্মম সাজার বিল পাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করে সকল ভারতবাসী মুক্তির সোপান তৈরি করা হোক।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক**, শান্তিপুর।

বিভূতিভূষণ

পত্রিকার ২৮ অক্টোবর '১৯ সংখ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের' প্রকৃতি-নিবিড় সম্পর্কের বিভিন্ন উপন্যাস যথা পথের পাঁচালী, আরণ্যক, হীরা মানিক জ্বলে ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য 'চাঁদের পাহাড়' যেখানে তিনি নিজে আফ্রিকা ভ্রমণ না করেও কেবল কল্পনাশক্তির জোরে আফ্রিকার

অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন। তার নিজের জীবনের কিছু ঘটনাও ততোধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। দ্বিতীয়বার বিবাহের পূর্বে তিনি প্ল্যানচেটের মাধ্যমে তার মৃত মায়ের সম্মতি লাভ করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ঘাটশিলায় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এঁদেলবেড়া হ্রদের সামনে যান। সেখানে বনের মধ্যে আলো দেখে একাই এগিয়ে যান। একটি ঘাটে ঢাকা দেওয়া শায়িত মনুষ্যদেহ দেখে চাদর সরিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। তিনি নিজেরই প্রতিরূপ দেখেছিলেন বলে জানা যায়। এরূপ নিজেই নিজের মৃতদেহ দেখার আরও উদাহরণ দেখা গেছে। তারপর কেউই আর বেশিদিন বাঁচেননি। বিভূতিভূষণও সাত/আটমাস বাদে ১৩৫৭ সালে ১৫ কার্তিক দেহত্যাগ করেন।

—**ভোলানাথ নন্দী,** মানিকপুর, মেদিনীপুর।

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি

কলকাতা শহরের পণ্ডিত নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী অতি সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রাচীন মায়াপুর (খোড়াডাঙ্গা) কিংবা মায়াপুরে (বারডাঙ্গা) জগন্নাথ মিশ্রের ভদ্রাসন ছিল এ কথা সত্য নয়। অন্যদিকে নৌকায় বসে সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ পরমহংস বললেন, বর্তমান গঙ্গার অতলতলে চৈতন্যের জন্মভূমি তলিয়ে গিয়েছে, এমন মহাবাক্যিও সত্য নয়। শ্রীচৈতন্যের সমসময়িক উদ্ধব দাস কাজী দলনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

''পারডাঙ্গা উত্তরেতে রাজপণ্ডিতের ভিতে
ভক্তগণে মহাসুখী করি।
বায়ুকোণে কিছুদূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজগৃহে আইলেন গৌরহরি।।"

ভাদুড়ীমশাই, আপনার ভাদুড়ীগাঁও চলনবিলের ধারে বারেন্দ্র বঙ্গে। আপনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ যদি পশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের জন্মভূমি খুঁজতে চান, চলে যান নবদ্বীপে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাপের বাড়ির সন্ধান পেলেই চৈতন্যের ভিটে মাটির সন্ধান পাবেন।

—**মৃণাল হোড়,** চন্দরনগর।

ছাত্র-ছাত্রীদের দুরবস্থা

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরের পরীক্ষার্থীরা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে যানবাহনের অপ্রতুলতার মধ্য দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলোর পরীক্ষার্থীদের পৌঁছতে কম করেও ২০/২৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে পরীক্ষকেন্দ্রের দূরত্ব অনেক ক্ষেত্রেই ৩৮-৪০ কিলোমিটার, এমনকী ৫০ কিলোমিটার পর্যন্তও হয়ে যেতে পারে। এই দীর্ঘপথ যাত্রা করে গ্রামীণ কলেজগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা এ প্রান্তর সে প্রান্তর দৌড়ে বেড়াচ্ছে। গত বছরও বলা হয়েছিল যে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি বা বেসরকারি বাসের বন্দোবস্ত করলে রতুয়া, নূরপুর, মানিকচকের পরীক্ষার্থীরা কিছুটা সহজে নিজ নিজ পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিমশীতল মানসিকতা ও উদাসীনতা বিদ্যমান। যানবাহনের প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সামনে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা আরাম, বিলাসিতা, ভোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে কলকাতা-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কলেজগুলো লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করলেও, সেই টাকার অর্থাৎ সেন্টার ফি বাবদ আদায় করা টাকার উপর ভাগ বসাচ্ছে কলেজের অশিক্ষক কর্মচারীরা। খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে পরীক্ষাতে সামান্য কাজ করে কিংবা কোনো কাজ না করেই প্রতিটি অশিক্ষক কর্মচারী হাজার হাজার টাকা পরীক্ষাশেষে লুট করে নিচ্ছে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার আগেই কলেজগুলোর অশিক্ষক কর্মীরা পরীক্ষার টাকার অর্থাৎ ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ কীভাবে ভাগ বাটোয়ারা করা হবে, সেই ব্যাপারে মহড়া দিতে থাকে। ঘন ঘন মিটিংয়ে অশিক্ষক কর্মীরা টাকা নেওয়ার হিসেব দিতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকার উপর কলেজের কর্মচারীদের প্রচণ্ড লোভ। পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। বর্ষার থকথকে কালো কাদার উপর দিয়ে পা কর্দমাক্ত করেই ছাত্র-ছত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্রের কক্ষে প্রবেশ করতে হয়। জামা-কাপড় জুতো নোংরা হয়ে গেলেও ছাত্র-ছাত্রীরা হাত-পা ধোওয়ার জল পাচ্ছে না, অথচ অশিক্ষক কর্মচারিরা ছাত্র-ছাত্রীদের সব টাকা লুট করে নিচ্ছে। টি.আই.সি.-সহ অশিক্ষক কর্মচারীরা পরীক্ষা শেষে অক্লেশে নিচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো ন্যায় বিচার পাচ্ছে না! ন্যায় বিচারের কোনো ধারণাই নেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

—**শুভ্র সান্যাল,** ইংরেজবাজার, মালদহ।

With Best Compliments From :-

KEDIA POLYMER

201, Marshall House, 2nd Floor,
25, Strand Road,
Kolkata - 700 001
West Bengal, India
Phone : 2213 7428 / 29, Fax : 22137430
Mobile : 84200 07171
Email : vipul@kediapipes.com

অঙ্গনা

সুন্নী শরই আদালতে মহিলাদের অধিকারের জয়ধ্বনি

সুতপা বসাক ভড়

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটপূর্ব প্রতিশ্রুতি— 'হমে ইয়ে করনা হ্যায়', 'হমে ইয়ে দেখনা হ্যায়' ক্ষীণ হয়ে আসে, যখন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মহিলা সশক্তিকরণের পথে কিছু শক্তিশালী পদক্ষেপ নেয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো তৎকাল তিনতালাকের ওপর কার্যকরী আইন। এটি একটি সুখময় বাস্তব যে, তিনতালাকের বিরুদ্ধে যে আইন কার্যকরী হয়েছে সেটি হয়ে উঠেছে মুসলমান মহিলাদের শক্তি। সমগ্র দেশের শরই আদালতগুলির দৃশ্য মূলত একইরকম। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ-সহ অন্যান্য রাজ্যগুলিতে শরই আদালতের কার্যকলাপ কমে যাচ্ছে। সুন্নি মুসলমান মহিলা অধ্যুষিত উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে আলা হজরত দরগার সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি শরই আদালতে এই ধরনের মামলার সংখ্যা ষাট শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদেও একই পরিস্থিতি। আইনটি কার্যকর হবার পর এখানকার দুটি শরই আদালতে প্রত্যেকদিন একটি-দুটি মামলা আসছে, অথচ এর আগে এই সংখ্যা প্রত্যহ আট পর্যন্ত হতো। সমগ্র দেশের বাষট্টিটি শরই-আদলতের এই শূন্যতা মুসলমান মহিলাদের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখন তিনতালাক দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এর ফলে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ এসেছে। বর্তমানে পীড়িতা মহিলারা, তাঁদের বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচার শরই আদালতে জানানোর পরিবর্তে সোজাসুজি মুসলমান মহিলা (বিবাহ অধিকার সংরক্ষণ) আইনের মাধ্যমে

আদালতে জানাচ্ছেন। এই আইনটি কার্যকরী হবার ফলে, পীড়িতা মহিলাদের মধ্যে স্বস্তি এসেছে। এর ফলে তাঁদের স্বামীরা জেলে যাবার ভয়ে মামলাটি আদালতে নিষ্পত্তি হবার আগে যাবতীয় সমস্যা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নিচ্ছে। মোরাদাবাদের মহল্লা অসালতপুরা নিবাসী চাঁদনি দশদিন আগে তার শোহরের বিরুদ্ধে তিন তালাকের মামলা থানা গলশহিদ-এ দায়ের করিয়েছিল। জেলে যাবার ভয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতেই তার স্বামী সেই মামলাটি মিটিয়ে নেয়। এরপর চাঁদনি বিবি তার শোহরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়।

নবাবগঞ্জ বেরিলির বেবি আফরোজ কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে, তার শোহর তিন তালাক শুনিয়ে, তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। জটিলতা আরও বেড়ে যায়, যখন জানা গেল যে বাচ্চাটির হৃৎপিণ্ডে একটি ফুটো আছে। 'মেরা হক' ফাউন্ডেশান-এর উদ্যোগে ডি. এম-এর প্রয়াসে সরকারি আর্থিক সহায়তা পাইয়ে বাচ্চাটির অপারেশনে সব ব্যবস্থা করায়। এছাড়াও বেবির স্বামীকে আলাদাভাবে ডেকে ভালোভাবে বোঝায়। ফলস্বরূপ, বেবি তার স্বামীর সঙ্গে পুনরায় শ্বশুরবাড়িতে সংসার করছে। বর্তমানে ভারতে বাষট্টিটি শরই আদালত আছে, কিন্তু তিন তালাক বিরোধী আইন কার্যকরী হবার পর থেকে পীড়িতারা এখন তাঁদের অভিযোগ থানায় দায়ের করছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের থানায় তিন তালাকের মোকদ্দমার সংখ্যা এইরকম :

মীরাট—৯৫,	কানপুর—২০
বেরিলি—৬৮	রামপুর—৩৭
মোরাদাবাদ—১২	বিজনৌর—৬০
সম্ভল—২৩	গোরক্ষপুর—৯৩
আগরা—২৬	বারাণসী—০৮
অমরোহা—২৮	প্রয়াগরাজ—০৭
লক্ষ্ণৌ—২৬	

বেরিলি, উত্তরপ্রদেশের দরগা আলা হজরতের অঞ্জীম উলমা-এ- ইসলাম-এর মৌলানা শাহাবুদ্দিন রজবিরের মতে তিন তালাকের আইন তৈরি হবার পরে ষাট শতাংশেরও অধিক মামলা শরই আদালতে কম হয়েছে। বেরিলির দরগা-আলা-হজরতের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক শরই আদালতে আগে প্রত্যহ গড়ে ছয়টি করে মামলা দায়ের করা হতো, কিন্তু বর্তমানে বড়োজোর একটি-দুটি মামলা আসে। তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যায়।

বেরিলির মেরা হক-এর অধ্যক্ষা ফরহত নক্‌বি জানালেন যে শরই আদালতে মুসলমান মহিলাদের কথা শোনাই হতো না। একতরফা ফয়শালা শুনিয়ে তিন তালাককে কার্যকর করা হতো। কিন্তু তিন তালাকের ওপর আইন তৈরি হবার পরে মুসলমান মহিলারা অনেক স্বস্তি পেয়েছেন। এখন বিচারের জন্য তাঁরা পুলিশের কাছে যাচ্ছেন। দেশের মুসলমান মহিলাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন! ■

মোবাইল ফোন আপনার শরীরের ক্ষতি করতে পারে

রিংকী ব্যানার্জি

বর্তমান সময়ে মোবাইল আমাদের ব্যবহারিক জীবনের একটি আপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। দিনের বেশিরভাগ সময়ে এখন মানুষ মোবাইল নিয়েই সময় কাটাতে ভালোবাসে। বলা যায়, মোবাইলের ওপর মানুষের একটি নির্ভরতা তৈরি হয়ে গেছে। কাজের সময় ছাড়াও মোবাইল প্রীতি মানুষের জীবনে এতটই বেশি যে একমুহূর্ত মানুষ তাকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। এমনকী অনেকেই রাত জেগে মোবাইলে কথা বলা থেকে শুরু করে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তবে সকলেরই জানা প্রয়োজন, এই অপরিহার্য জিনিসটির অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের শরীরে অজান্তেই নানা ধরনের বিপদ ডেকে আনছে।

মোবাইল ফোন নিয়ে কী সতর্কবাণী দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা জেনে নেওয়া দরকার :

মোবাইল ফোন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভের ভিত্তিতে কাজ করে। এক্সরে, আলট্রা ভায়োলেট বা গামা বিকিরণে যা ব্যবহৃত হয়, এটি তার চেয়ে অনেক কম ক্ষমতার। তবে এটিও মানব শরীরে প্রভাব ফেলে। আমাদের চারপাশে এরকম অসংখ্য বিকিরণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেমন এফএম বেতারে তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ আর বাতির বিকিরণ। মোবাইল ফোন হয়তো ব্রেন টিউমারের ঝুঁকি অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে একটি মাইক্রোওয়েভ যেভাবে কাজ করে, সেভাবে এরকম বেতার তরঙ্গ মানুষের শরীরের কোষের উষ্ণতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

মোবাইল ফোনের বিকিরণে মাত্রা খুবই কম এটা শরীরের কোষকে কতটা উষ্ণ করতে পারে, তা পরিষ্কার নয়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, আগাম সতর্কতা হিসেবে মোবাইল ফোনকে সব সময় শরীরের কাছাকাছি না রাখাই ভালো।

মোবাইল ফোনের কোম্পানি বা উৎপাদক ভেদে একেকটি ফোনের

বিকিরণের মাত্রা কম বেশি হয়। ফোনের বক্সের কাগজপত্র বা অনলাইনে এসব তথ্য থাকলেও, খুব কম গ্রাহকই সেগুলো পড়ে দেখেন।

বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন, একটি পারমাণবিক চুল্লির যে বিপদ তাঁর থেকে মোটেও কম নয় এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষতি। যাঁদের করোটি যত পাতলা, তাঁদের মোবাইল এফেক্ট তত বেশি। ব্রেন টিউমার থেকে শুরু করে নাভার্স সিস্টেম ব্রেকডাউন, হার্ট অ্যাটাক সব কিছুরই সম্ভাবনা রয়েছে।

মোবাইল ফোন ব্যবহারে ফলে আমাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ উতপ্ত হয়ে ওঠে। তার ফলে মস্তিষ্কের টিস্যুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেই সঙ্গে ঝড়ের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে সমূহ বিপদ দেখা যেতে পারে।

বুক পকেটে মোবাইল রাখলে হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ইয়ার ফোন ব্যবহার না করে, কানের গোড়ায় রেখে মোবাইলে কথা বললে কানে কম শোনা এমনকী বধিরতার আশঙ্কাও পর্যন্ত থাকতে পারে।

অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার করলে মুখে ক্যান্সার বা ম্যালিগ্যান্ট টিউমারের ঝুঁকি বাড়ে।

শিশুরাও মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে থাকে। শিশুদের মস্তিষ্কের কোষ নরম বলে তাদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। তড়িৎ চুম্বকীয় দূষণের কারণেই শিশুরা এপিলেপিস ও অ্যাজমায় ভুগছে। শিশুদের কাছ থেকে সেলফোন সব সময় দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

সেলফোন-এর প্রতিটি কল আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। এমনকী প্যাসিভ স্মোকারদের মতো যে লোকটা মোবাইল ব্যবহার করছে না, কিন্তু মোবাইল ব্যবহারকারীর কাছে রয়েছে তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সেলফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন স্নায়বিক সমস্যার শিকার। যেমন মাথাঘোরা, ক্লান্তি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মাথা ঝিমঝিম করা ক্লান্তি প্রভৃতি।

কীভাবে বিকিরণ থেকে বাঁচা যায় :

ফোনে অ্যান্টেনার কাছে সবচেয়ে বেশি বিকিরণ ছড়ায়। আধুনিক ফোনগুলোয় ফোনের ভেতরে অথবা পেছনে এই অ্যান্টেনা বসানো থাকে। বেশিরভাগ মানুষ ব্যবহার করার সময় অ্যান্টেনা মাথার উল্টো দিকে থাকে। কিন্তু মাথার যত কাছে এই অ্যান্টেনা থকে, ততই ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

মোবাইল ফেনের কাছাকাছি শরীরের যে সব কোষ থাকে, সেগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর দূরের কোষ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ▮

রামজন্মভূমি আন্দোলন

১৫২৮

বাবরের সেনাপতি মির বাকি অযোধ্যার রামজন্মস্থানে হিন্দু স্থাপত্য ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেন। অভিযোগ, ওই স্থাপত্য কোনও মন্দিরের। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে মন্দিরের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

১৮৫৯

ব্রিটিশ সরকার প্রাচীর তুলে হিন্দু মুসলমান দুই পক্ষের উপাসনা-স্থল আলাদা করে দেয়। মুসলমানদের নমাজ পড়ার জায়গা মসজিদের ভেতরে আর হিন্দুদের পুজার্চনার জায়গা বাইরে।

১৮৮৫

রাম চবুতরায় মন্দির নির্মাণের জন্য মহন্ত রঘুবীর দাস আবেদন করেন। কিন্তু ফৈজাবাদ জেলা আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়।

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৯

মসজিদের ভেতরে রামলালার মূর্তি পাওয়া যায়। মুসলমানদের অভিযোগ ছিল, হিন্দু পক্ষ ২২-২৩ ডিসেম্বরের রাতে মূর্তি রেখে এসেছে। দু' পক্ষই মামলা দায়ের করে। সরকার দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়।

১৬ জুন, ১৯৫০

গোপাল সিংহ বিশারদ প্রথম টাইটেল স্যুটটি দায়ের করেন। তাঁর দাবি, আদালত অস্থায়ী মন্দিরে রামলালার ভজন-পূজনের অনুমতি দিক।

১৯৫৯

রামজন্মভূমির মালিকানা স্বত্ব দাবি করে তৃতীয় টাইটেল স্যুটটি দায়ের করে নির্মোহী আখড়া। তারা নিজেদের মির বাকির ধ্বংস করা রামজন্মস্থান মন্দিরের প্রাচীন সেবায়েত বলেও দাবি করেছিলেন।

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬১

বাবরি মসজিদ এবং তার চারপাশের জমির মালিকানা স্বত্ব দাবি করে আদালতে মামলা করে ইউপি সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড।

১৯৮৩

অযোধ্যার বহুচর্চিত জমিতে রামমন্দির নির্মাণের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

হরিশঙ্কর দুবের আবেদনে সাড়া দিয়ে জেলা আদালত বিতর্কিত স্থানের গেট খুলে দিয়ে হিন্দুদের রামলালা দর্শনের পক্ষে রায় দেয়। প্রতিবাদে মুসলমান পক্ষ বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি গঠন করে।

১৯৮৯

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি দেওকীনন্দন আগরওয়ালা শ্রীরামকে বাদীপক্ষ করে একটি পৃথক মামলা দায়ের করেন। যে মামলায় শ্রীরামের দাবি ছিল, তাঁর নামাঙ্কিত জন্মস্থানের জমি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চে মামলাটি দায়ের করা হয়।

নভেম্বর, ১৯৮৯

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী গুজরাটের সোমনাথ থেকে অযোধ্যায় তাঁর বিখ্যাত রামরথযাত্রা শুরু করেন। তাঁকে বিহারে গ্রেপ্তার করা হয়।

নভেম্বর, ১৯৯০

করসেবকদের দমন করতে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ উন্মত্তের মতো আচরণ করে। পুলিশের গুলিতে বহু করসেবক মারা যান।

৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা এবং বিজেপির কর্মীরা বাবরি মসজিদের ধাঁচা ভেঙে দেয়। মুসলমানরা দেশজুড়ে হিন্দু নিধন শুরু হয়। ২০০০ হিন্দুর মৃত্যু হয়।

এপ্রিল, ২০০২

জমির মালিকানা স্বত্ব কার— এলাহাবাদ হাইকোর্ট শুনানি শুরু।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় : ২.৭৭ একর জমি ২ : ১ অনুপাতে হিন্দু এবং মুসলমান পক্ষের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক।

৯ মে, ২০১১

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ।

৮ মার্চ, ২০১৯

সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতা কমিটি গঠন করে। কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এফ এম কলিফুল্লা। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশ্রী রবিশংকর, শ্রীরাম পঞ্চু প্রমুখ।

২ আগস্ট, ২০১৯

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয় মধ্যস্থতার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ৬ আগস্ট থেকে আদালত মামলাটি শুনবে। শুনানি হবে প্রতিদিন।

৯ নভেম্বর, ২০১৯

পাঁচজন বিচারপতি সর্বসম্মতিক্রমে রায় ঘোষণা করেন। অযোধ্যার বহুচর্চিত জমিটি হিন্দুদের। মুসলমানরা জমির মালিকানা প্রমাণ করতে পারেনি। সুতরাং অযোধ্যারই অন্য কোথাও তাদের ৫ একর জমি দেওয়া হবে মসজিদ বানানোর জন্য। আর রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণের দায়িত্ব থাকবে একটি ট্রাস্টের ওপর। ■

লালকৃষ্ণ আদবানীর নেতৃত্বে সোমনাথ থেকে অযোধ্যার পথে এগিয়ে চলেছে রামরথ।

রামমন্দির রাষ্ট্রীয় অস্মিতার প্রতীক

সঞ্জয় সোম

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে যে মন্দির তৈরি হবে তাতে শুধু যে রামলালা মাথার ওপর ছাদ ফিরে পাবেন তা নয়, সারা দেশের সমস্ত সৎ, নিষ্ঠাবান, ধর্মবিশ্বাসী, সনাতন জীবনপদ্ধতির অনুসারী, কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী মানুষের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক— একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া আশ্রয়স্থল আবার গড়ে উঠবে, মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট অবশেষে সেই রাস্তা খুলে দিয়েছেন। প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভারতের ঋষিঋদ্ধ অন্তরাত্মাকে ভুলিয়ে দেওয়ার বিজাতীয় চক্রান্ত সত্ত্বেও, আজও ভারতের 'রোম রোম মে বসে রাম', অর্থাৎ প্রতিটি ভারতীয়র প্রতিটি রোমকূপে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র সদাজাগ্রতই আছেন। বাঙ্গালির সঙ্গে অকালবোধন এবং শ্রীরামের যোগের ফলে বাঙ্গলার গ্রামেগঞ্জে প্রতিদিন রামায়ণপাঠের একটি পরম্পরা এখনো রয়ে গেছে। খোদ কলকাতায় আমাদের ছেলেবেলায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা 'ছেলেদের রামায়ণ' পাঠ্যপুস্তক ছিল। যতদূর জানি, আমাদের পরবর্তীকালেও পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে বহুদিন পর্যন্ত রামায়ণ পাঠ্য ছিল, হালফিলের কথা ঠিক বলতে পারবো না। সেই যে ছেলেবেলায় প্রতি সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরমার সুর করে রামায়ণ পাঠের মাধ্যমে যাঁর সাথে পরিচয়, যত বয়স বেড়েছে তত সেই রামচরিত্রের বিভিন্ন দিক আমায় নতুন করে ভাবিয়েছে। মনে আছে, কৈশোরে উপহার পেয়েছিলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। সবেমাত্র প্রথম কয়েকপাতা পড়েছি, শ্রীমর সাথে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মোটে তৃতীয় সাক্ষাৎকার, দেখি ঠাকুর ওঁকে বলছেন, 'বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁকে লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে পড়ল। তার সেতুর দরকার নেই'। তারপর যত এগোতে লাগলাম তত দেখলাম বারবার ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন গল্পছলে, তার কিছু ঘটনা আমি ছেলেবেলায় পড়েছি, অনেকটাই অজানা, যা যৌবনে নতুন করে বাল্মীকি রামায়ণ পড়তে উদ্বুদ্ধ করলো।

একজন অমিতবিক্রম রাজপুত্র, যিনি এক বিখ্যাত রাজবংশের পরবর্তী রাজা, যাঁকে বিয়ে করার জন্য তৎকালীন সমস্ত বিবাহযোগ্যা রাজকন্যারা উদগ্রীব, তিনি গুরুবাক্যের মর্যাদা রক্ষা করতে হরধনু ভেঙে কাকে বিয়ে করছেন, না জনকরাজার এক অজ্ঞাত কুলশীল পালিতা কন্যাকে! রামের তখন বয়স ২৫ আর সীতার ১৮। তারপর ১২ বছর সুখে ঘরকন্না করার পর, যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত অত্যন্ত জনপ্রিয় সেই রাজকুমার পিতার দেওয়া কথার মর্যাদা রক্ষা করতে সব ছেড়ে বনে চলে গেলেন, তখন তাঁর বয়স ৩৭ আর সীতার ৩০। তারপর চোদ্দ বছরের বনবাসের শেষ বছর, অর্থাৎ ১৩তম বছরে সীতা অপহৃত হলেন। তারপর আমরা দেখি এক মধ্যবয়সী স্বামী তাঁর মধ্যবয়সী স্ত্রীকে খুঁজতে এবং সেই পথচলাকালীন সারা ভারতবর্ষকে এক সূত্রে বাঁধতে বাঁধতে, সৈন্য জোগাড় করতে করতে ঠিক রাবণের দরজায় হাজির হয়ে যান আর কঠিন যুদ্ধের শেষে স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে যায় এখানে। সে আমলে তো রাজপুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত এবং স্বাভাবিক ছিল, শ্রীরামচন্দ্র কেন সে পথে হাঁটলেন না? একজন রাজকুমারের বন্ধু হবেন ক্ষমতাবান উচ্চবংশের সন্তানরা, এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু হলেন চন্ডাল, যে মধুর সম্পর্কটি বাঙ্গালি রামায়ণকার বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

'প্রভাতে করিয়া যাত্রা দিবসের শেষে।
পৌঁছাইল গঙ্গা তীরে গুহকের দেশে।।
রামের সে বন্ধু ছিল গুহক চণ্ডাল।
থাকিতে বলিল রামে সেথা চিরকাল।।
গুহকে কহিল রাম আলিঙ্গন করি।
চোদ্দসাল পর ঠিক আসিবেন ফিরি।।'

তারপর আরও মজার ব্যাপার হলো, ভবিষ্যতের রানি অপহৃত হলেন অথচ রাজা কিন্তু তাঁর ভাইয়ের কাছে সৈন্যসামন্ত চেয়ে পাঠালেন না, যা

তিনি সহজেই করতে পারতেন, যেহেতু তিনি পিতৃশর্ত পালন করে তখন রাজদায়িত্বমুক্ত। এই যে বিরাট সৈন্য তিনি একত্রিত করলেন, সেটা তো আর ভয় দেখিয়ে হয়নি, দুই কপর্দকশূন্য, ক্ষমতাহীন ভবঘুরে ভাইকে কেই বা ভয় পাবে? সারা ভারতবর্ষের সমস্ত জনজাতিকে শ্রীরামচন্দ্র প্রেম দিয়ে জয় করেছিলেন এবং আমরা যদি রামায়ণে বর্ণিত যাত্রাপথটিকে অনুসরণ করি, তাহলে দেখবো যে উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা ভারতবর্ষকে এক সূত্রে গেঁথে তার বর্তমান ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক রূপ দেওয়ার পুরোধা হলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় চক্রবর্তী সম্রাট শ্রীরামচন্দ্র। কারো ওপর নিজেকে জোর করে চাপিয়ে দেননি, কারো মর্যাদাহানি করেননি, অথচ আপামর জনতার হৃদয় জিতে নিয়ে অবিসংবাদী ভারতসম্রাট হয়েছেন, তাই নিঃসন্দেহে তিনিই আমাদের রাষ্ট্রপুরুষ।

বারেবারে কেন শ্রীরামচন্দ্রকে মাপকাঠি করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ভাব ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা বুঝতে গিয়ে মনে হয়েছে যে পিতৃভক্ত, বন্ধু-বৎসল, প্রজাহিতৈষী, ভ্রাতৃ-বৎসল, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সুবিচারক, যজ্ঞকারী, মর্যাদা-পুরুষোত্তম, একাধারে এমন নায়ক আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। যখন শুনি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এবার এই শরীরে রামকৃষ্ণ', তখন মনে হয় এইবার ঠিক ঠিক মিলেছে। যখন দেখি ভাবে সীতার হাতে মকরমুখী বালা দেখে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য অমনটাই তিনি বানিয়ে দিচ্ছেন, তখন মনে হয় রাম আর সীতা তো যুগে যুগে এক এবং অবিচ্ছেদ্য। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এত কিছুর পরেও কেন সীতাকে বনবাসে পাঠালেন শ্রীরামচন্দ্র। যেদিন বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' পড়লাম, সেদিন বিষয়টা একদম দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র জানতেন যে তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা এবং অবশ্যই সেই সন্তান একদিন তাঁর সাম্রাজ্যের সম্রাট হবেন। কিন্তু যেহেতু গুপ্তচর মারফত খবর পেলেন যে প্রজাদের মধ্যে রানির চরিত্র নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্তব্য স্থির হয়ে গেল যাতে ভবিষ্যতের রাজা এবং প্রজার মধ্যে সন্দেহের আবহ সৃষ্টি না হয় এবং রাজ্যপরিচালনা নির্বিবাদে চলে। চরম ক্ষমতাবান এবং জনপ্রিয় একজন মানুষের কী অপরিসীম ত্যাগ, আজকের দিনে কল্পনাও করা যায় না। প্রজার স্বার্থে বহুকষ্টার্জিত সাংসারিক সুখ, প্রিয়া, পুত্র সব বিসর্জন দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য ভাইয়ের ছেলেদের হাতে তুলে

অযোধ্যা আন্দোলনে রক্তাক্ত অশোক সিংঘল

সুপ্রিমকোর্টের স্বস্তিদায়ক নির্ণয়ের পর দীর্ঘদিনের বিবাদ ভুলে সমস্ত ভারতবাসী শ্রীরামমন্দির নির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, রাষ্ট্রীয় গরিমা, রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হবেন এবং জাতি পন্থ বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত গর্বিত ভারতবাসী সক্রিয়ভাবে এই রাষ্ট্রীয় অস্মিতার প্রতীকের অংশীদার হবেন।

দিতে যাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। রাষ্ট্রনায়ক বলুন, রাষ্ট্রপুরুষ বলুন, রাষ্ট্রবিধাতা বলুন, এমন একজন দেবচরিত্রের অধিকারীই তো দেশবাসীর অনুকরণীয় হবেন, তবে না রাষ্ট্রজীবনের সঠিক মাপদণ্ড তৈরি হবে।

শ্রীরামচন্দ্র গোটা ভারতের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উত্তরাধিকার। আমরা কে তাঁকে বিষ্ণুর অবতাররূপে পুজো করলাম আর কে তাঁকে উত্তম রাষ্ট্রপুরুষরূপে শ্রদ্ধা জানালাম, তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁর জীবন প্রত্যেক ভারতীয়র জীবনধারণের মানক, এটাই আসল কথা, উপাসনা পদ্ধতি যার যাই হোক না কেন। ভারতীয় মুসলমানদের পূর্বপুরুষ আর ভারতীয় হিন্দুদের পূর্বপুরুষ তো একই, এঁদের কেউ তো আর বিদেশি আক্রমণকারীর বংশধর নন। আর বিদেশি আক্রমণকারীর কুকীর্তি কোনো ভারতীয়র পক্ষে কখনোই গৌরবগাথা হতে পারে না। যদি হতো, তাহলে ভিক্টরিয়া মেমরিয়ালের সামনে প্রিন্স অ্যালবার্টের মূর্তি সরিয়ে ঋষি অরবিন্দের মূর্তিস্থাপন করার প্রয়োজন পড়তো না অথবা সোমনাথের মন্দির পুনর্নির্মাণের। আমরা এক রাষ্ট্র, এক জাতি, এক সংস্কৃতি এবং যাঁরা এই প্রাচীন বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সগর্বে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রণম্য। যেমন আব্দুল হামিদ বা আস্ফাকুল্লা খান বা ড. এপিজে আব্দুল কালাম। এর মধ্যে কোনো পন্থ নেই, প্রান্ত নেই, ভারতীয় ছাড়া অন্য কোনো পরিচয়ও নেই। এই সংস্কৃতি শ্রীরামচন্দ্রের সংস্কৃতি, শ্রীরামজন্মভূমি তার মূর্ত প্রতীক। বস্তুত এই পবিত্র ভূমি আমাদের রাষ্ট্রগৌরবের প্রতীকও বটে কারণ যে বিদেশি আক্রমণকারীরা সেই মন্দির ভেঙেছিল, তারা আমাদের রাষ্ট্রীয় গরিমাকে আঘাত করতে চেয়েছিল, আমাদের পরাধীনতার দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন স্থাপন করতে চেয়েছিল। ভালো হতো আগেই যদি ধর্মীয় সমীকরণের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত দেশবাসী এককাট্টা হয়ে রাষ্ট্রীয় অস্মিতার নিদর্শনরূপে রামজন্মভূমিতে মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেন। শ্রীরামজন্মভূমিতে মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির তৈরি হবে, এটা কোনো ধর্মীয় বিষয় নয়, রাষ্ট্রগৌরবের বিষয়। ভারতের পুনরুত্থানের অস্ত্র হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেইসব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন, তাঁদের—লোকের কাছে ideal (আদর্শ বা ইষ্ট)-রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর....দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি।" আশা করা যায় যে এবার সুপ্রিমকোর্টের স্বস্তিদায়ক নির্ণয়ের পর দীর্ঘদিনের বিবাদ ভুলে সমস্ত ভারতবাসী শ্রীরামমন্দির নির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, রাষ্ট্রীয় গরিমা, রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হবেন এবং জাতি পন্থ বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত গর্বিত ভারতবাসী সক্রিয়ভাবে এই রাষ্ট্রীয় অস্মিতার প্রতীকের অংশীদার হবেন। ■

লালকৃষ্ণ আদবানীর রামশিলা পূজন।

রামজন্মভূমি মামলার রায়ের বীজ লুকিয়েছিল লাহোরের শহিদগঞ্জ মসজিদ মামলায়

সুজিত রায়

গত ৯ নভেম্বর ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতি (একজন মুসলমান বিচারপতি-সহ) সর্বসম্মতভাবে অযোধ্যায় রামজন্মস্থানে রামমন্দির নির্মাণের সপক্ষে রায় দিয়েছেন। এর ফলে গত ১৯২ (১৫২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে) বছর ধরে চলে আসা রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ বিতর্কের অবসান হয়েছে। বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক ও ভূপর্যটকদের রেখে যাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে, 'রামজন্মভূমি' বলে চিহ্নিত অংশে কোনো একটি কাঠামো ভেঙে গড়া হয়েছিল বাবরি মসজিদ এবং ওই কাঠামো কোনোভাবেই ইসলামি স্থাপত্য ছিল না। ফলত গত ৭০ বছর (১৯৫০ সাল থেকে) ধরে চলে আসা আইনি লড়াইয়েরও নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন কোন যুক্তিতে মসজিদের অবস্থান ও প্রতিষ্ঠার দাবি উড়িয়ে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রামমন্দিরের পক্ষে রায় দিলেন? সুপ্রিম কোর্টের টানা ৪০ দিন শুনানি চলার পর পাঁচ বিচারপতি তাঁদের সর্বসম্মতভাবে দেওয়া ১০৪৫ পৃষ্ঠার রায়ে অনেক তথ্য, অনেক ইতিহাস, অনেক বিশ্বাস, অনেক পুরাতত্ত্ব ও অনেক পুরাণের তত্ত্ব দিলেও রায়টি দাঁড়িয়ে আছে মূলত দুটি যুক্তি ওপর।

প্রথমটি হলো : দীর্ঘদিন ধরে, সেই ১৯৪৯ সাল থেকে হিন্দুরা বিতর্কিত কাঠামোয় শ্রীরামচন্দ্রের পূজার্চনা করে এসেছে কোনো বিরতি ছাড়াই। ফলে তাদের দখলিস্বত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

দ্বিতীয়টি হলো : মুসলমানরা ল অব অ্যাডভার্স পজেসন বা বিরূপ দখলি স্বত্ব প্রমাণ করতে পারেনি। যদিও অবস্থানগতভাবে বাবরি মসজিদ চাক্ষুষ করা যেত ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত। আরও একটি কারণ আইনগতভাবে হিন্দুদের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত মান্যতা দিয়েছে। তা হলো, ভারতীয় আইন মতে হিন্দু দেব-দেবীরা কোনো মামলায় বাদীপক্ষ হিসেবে মামলা করার অধিকারী (সম্ভবত তাদের অবয়ব দেখা যায় বলেই অর্থাৎ হিন্দুরা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী বলে)। কিন্তু অন্য কোনো ধর্মের দেব-দেবীরা এই অধিকার ভোগ করেন না। কারণ ইসলাম-সহ বহু ধর্মমতই নিরাকারবাদে বিশ্বাসী। অযোধ্যা মামলায় 'শ্রীরামলালা বিরাজমান' অন্যতম বাদীপক্ষ হিসেবে মামলা দায়ের করতে পেরেছিলেন। মুসলমানরা সেই সুবিধা পায়নি।

প্রশ্ন হলো, এই যুক্তিগুলি কি নতুন কিছু? নাকি সুপ্রিম কোর্টের এই যুক্তিগুলি অতীতে কোনো বিচারালয়ের আদেশনামারই পুনরুক্তি? একটু ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে পিছন ফিরে তাকানো যাক। সন ১৬৫৩। ভারতে তখন মোগল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহ-র প্রধান রাঁধুনির নাম দিল আবদুল্লাহ খান। শুধু সম্রাটপুত্রকে ভালো রান্না খাইয়ে তৃপ্ত করে পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন লাহোরের কোতোয়াল বা নিরাপত্তারক্ষায় প্রধান পুলিশ কর্তার পদ। তিনিই তাঁর প্রতিপত্তির জোরে গড়ে তুলেছিলেন আবদুল্লাহ খান মসজিদ যার কাজ সমাপ্ত করেছিলেন ফল্‌ক বেগ খান ১৭২২ সালে। দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ওই মসজিদের মুদায়ালি নিযুক্ত হয়েছিলেন শেখ দীন মুহম্মদ ও তাঁর বংশধররা।

মসজিদের কাছেই ছিল একটি জন-উদ্যান যা তৎকালীন পঞ্জাবের গভর্নর অষ্টাদশ

শতাব্দীতে অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্য বাছাই করেছিলেন। গভর্নর নবাব জাকারিয়া খানের হাতে সেসময় বহু বিদ্রোহী শিখও চরমতম শাস্তি পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তারু সিংহ যিনি মোগলদের বিরুদ্ধে শিখদের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই অপরাধে তারু সিংহের ওপর অকথ্য অত্যাচারের পর তার মাথা কেটে নেওয়া হয়। শিখ জনগোষ্ঠী তারু সিংহকে শহিদের মর্যাদা দেন এবং ওই জন-উদ্যানের নাম হয় শহিদগঞ্জ।

১৭৬২ সালে ভাসী শিখ সর্দারের সেনাবাহিনী লাহোর জয় করে এবং আবদুল্লাহ খান মসজিদ-সহ গোটা জন-উদ্যানটিই দখল করে নেয়। মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মসজিদের সামনের চত্বরে শিখরা নির্মাণ করেন শহিদগঞ্জ ভাই তারু সিংহ গুরুদোয়ারা। আর শিখ ধর্মপুরুষদের থাকার ব্যবস্থা হয় মসজিদের অভ্যন্তরে।

১৮৪৯ সালে ইংরেজরা পঞ্জাবের দখল নিলে শহিদগঞ্জ মসজিদকে ঘিরে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা শিখদের বিরুদ্ধে সরাসরি মসজিদ দখলের অভিযোগ আনে। মসজিদের মুদায়ালি শেখ দীন মুহম্মদের বংশধর লাহোরনিবাসী নূর আহমেদ ১৮৫০-এর ১৭ এপ্রিল পঞ্জাব হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে ১৮৫৩ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে শহিদগঞ্জ মসজিদ উদ্ধারের জন্য নূর মহম্মদ একাধিক মামলা করেন। কিন্তু একই মামলাতেই স্থিতাবস্থা জারি রাখার আদেশ দেয় আদালত।

১৯৩৫-এর ২৯ জুন শিখ জনগোষ্ঠী

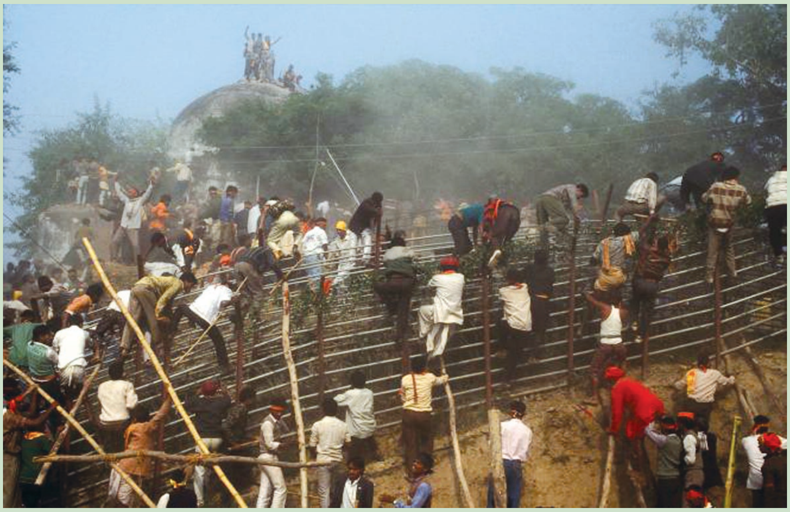

বিতর্কিত ধাঁচা ভাঙার লক্ষ্যে করসেবকরা।

প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, তাঁরা শহিদগঞ্জের মসজিদ পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেবেন। ঘোষণার অব্যবহিত পরেই হাজার হাজার মুসলমান মসজিদ রক্ষার্থে মসজিদের সামনে জড়ো হন। সেখানেই গঠিত হয় আঞ্জুমান-ই-তহযুদ্ধ-ই-মসজিদ শহিদগঞ্জ বা শহিদগঞ্জ মসজিদ রক্ষা সংগঠন। পঞ্জাবের তৎকালীন গভর্নর স্যার হার্বার্ট এমারগন দু'পক্ষের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৫-এর ৭ জুলাই মধ্যরাতে শিখরা শিখ ধর্মগুরুদের আদেশে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় প্রকৃত অর্থেই। যার ফলে গোটা লাহোর জুড়ে শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা এবং বিশৃঙ্খলা। ব্রিটিশ সরকার লাহোর শহরে কারফিউ জারি করতে বাধ্য হয়।

মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে নিয়ে তৎকালীন অখণ্ড ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে রীতিমতো ধর্মীয় উন্মাদনা ঘটে যায়। পাকিস্তানের শিয়ালকোট নিবাসী দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী মুসলমান সমাজের জনপ্রিয় নেতা হাজি হাফিজ পির সৈয়দ জামাত আলি শাহ সারা ভারত সুন্নি কনফারেন্সের ব্যানারে বিশাল আন্দোলন শুরু করেন। বাদশাহি মসজিদে বিশাল জনসভার পর শুরু হয় উত্তাল জনতার শহিদগঞ্জ মসজিদ অভিযান। সময় ১৯—২০ জুলাই ১৯৩৫। ২০ জুলাই পুলিস উদ্বেল জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে বাধ্য হয়। প্রায় ১২ জনের মৃত্যুর পর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ২১ জুলাই।

এরপর ২ মে ১৯৪০ বম্বে হাইকোর্ট মসজিদ শহিদগঞ্জ বনাম শিরোমণি গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটি মামলার রায়ে মসজিদের অস্তিত্ব ছিল বলে স্বীকার করেও স্ট্যাটিউট অব লিমিটেসনস (Statute of Limitations) বা সীমাবদ্ধতার কারণে সংবিধির রায় দেয়। অর্থাৎ রায়দানের পূর্বে ১৭০ বছর ধরে মসজিদ এবং মসজিদস্থল ব্যবহার করেছে শিখরা। ফলত ওই স্থানের ওপর তাঁদের অধিকার অস্বীকার করা যাবে না বলে আদালত রায় দেয়।

রামমন্দির নির্মাণের উদ্দেশে সাধুসন্তদের পূজন।

লাহোর হাইকোর্টের রায়ও ফুল বেঞ্চের রায় ছিল : "When a mosque is adversely possessed by non-Muslims, that is to say, Sikhs, the Muslims loss all the right in the land and the building, including the right to worship. The building cannot maintain the character of a mosque and no duty is cast upon the persons in possession there of to maintain its original character or to maintain it even as a building. All the rights of the Muslims being extinguished, including the right to pray, the persons in possession commit no wrong, much less

a continuing wrong by not permitting or refusing re-right of the Muslims to pray there in. A suit instituted by a Muslim as a beneficiary for the exercise of his right to pray at a Mosque is a suit for the enforcement of an individual right and is not covered by the provision of order 1, Rule 8 of the Code of Civil Procedure.'' (ARR Lahore 1938 Page 369) অর্থাৎ যখন কোনো মসজিদ অমুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হয়ে যায় এবং মুসলমানরা সেখানে নমাজ পাঠেরও অনুমতি পায় না, তখন সেই মসজিদের ওপর মুসলমানদের কোনো স্বত্ব থাকতে পারে না। অধিকারীরা ওই মসজিদের চরিত্র বদলাতেও পারে যদি তাঁরা তা চান। এক্ষেত্রে কোনো মুসলমান দেওয়ানি কার্যবিধির অর্ডার ১ রুল ৮ অনুসারে মামলা করতে পারবেন না। এরপর প্রিভি কাউন্সিলও লাহোর হাইকোর্টের মামলার রায়ই বহাল রাখল। কারণ আইনসংগতভাবে শিখরা যথেষ্ট ভালো জায়গায় অবস্থান করছিল। প্রিভি কাউন্সিল রায় দিল—''There is no analogy between the position in Law of a building dedicated as a place of prayer for Muslims and the individual Dieties of the Hindus. The Land and building of a mosque is ordinary property and not a 'Juristic Person'. A suit cannot be brought by or against a mosque in its name. The right of a Muslim worshipper at a particular mosque may be regarded as an individual right. It is not a short of easement in gross but an element in the general right of a beneficiary to have the waqf property recovered by its proper custodian and applied to its proper purpose. Such an individual may, if he sues in time, procure the ejectment of a trespasser and have the property delivered to the mudawalli for the purpose of the waqf. But if the title confered by the settler has come to an end by reason that for the statutory period no one has sued to eject a person possession adversly to the waqf, the rights of all the beneficiaries are gone to land of the place cannot be recovered by and for the mudwalli and the endowment, or its terms can no longer be enforced.'' (AIR 1940 PC 116/1940 ALJ522)

অর্থাৎ এখানে পরিষ্কারভাবেই বলে দেওয়া হয়েছে মসজিদ বাদী পক্ষ হতে পারে না। কোনো একজন মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে নমাজ পড়ার অধিকার চাইতে পারেন কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের অধিকার হিসেবে ধর্তব্য হবে না। বিশেষ করে ওই মামলায় মুসলমানরা দখলদারদের সরাতে দীর্ঘদিন ধরে মামলা করেনি। ফলত তার ওপর আর মুসলমানদের অধিকার থাকতে পারে না।

উল্লেখ্য, রামমন্দির মামলাতেও একই ঘটনা ঘটেছে। প্রথমত মূল মামলাটি (নং ১২/১৯৬১) হয়েছিল দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ অনুযায়ী। অর্থাৎ শহিদগঞ্জ মামলার মতোই যেহেতু বাবরি মসজিদ দখল করে রেখেছিল হিন্দুরা সেই ১৯৪৯ সাল থেকে এবং মসজিদের ভিতরেই শ্রীরামচন্দ্রের পুজা অর্চনা চলছিল কোনো বিরতি ছাড়াই এবং যেহেতু ১৯৩৪ সালে এক দাঙ্গার পর থেকে মুসলমানরা বাবরি মসজিদে কখনও নমাজ পাঠে অংশ নেয়নি, মামলাও করেনি, স্বাভাবিকভাবেই বাবরি মসজিদের ওপর হিন্দুদের অধিকার জন্মে গিয়েছিল। আদালত সেই অধিকারকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যক্ষতই অভিমত দিয়েছে, বিতর্কিত কাঠামোয় হিন্দুরা টানা পুজার্চনার বহু প্রমাণ দিতে পেরেছেন। বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন তা হলো 'actual worship down the centuries'। শুধু তাই নয়, বিদেশি পর্যটক উইলিয়ম ফিঞ্চ এবং ফাদার জোসেফ টাইফেন্ডফলার-এর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ইতিহাসেও দেখা গেছে (১৬০৭ থেকে ১৬১১ এবং ১৭৮৬ থেকে ১৭৭১) বিতর্কিত জায়গাটিকে হিন্দু জনগণ শ্রীরামের জন্মস্থান বলেই বিশ্বাস এবং বিবেচনা করতেন। সেই সঙ্গে চলত পুজার্চনাও। অতএব বিতর্কিত স্থানে হিন্দুদের Possessory title মেনে নিতেই হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শহিদগঞ্জ মসজিদ মামলায় একথা প্রমাণ হয়েছিল যে মূল জায়গাটিতে মসজিদই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং সেটির অবস্থান থাকাকালীনই তা দখল করে শিখরা। কিন্তু তারপর মুসলমানরা শত বছর ধরে মসজিদে প্রবেশাধিকার পায়নি। অর্থাৎ মুসলমানরা বিরূপ দখলি স্বত্ব প্রমাণ করতে পারেনি। বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রেও ওই ল' অব অ্যাডভার্স পজেসন বা বিরূপ দখলি স্বত্ব প্রমাণ করতে পারেননি মুসলমানরা। কারণ আইন অনুযায়ী বিরূপ দখলি স্বত্ব হতেই হবে 'adequate in continuity' অর্থাৎ দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে এবং 'must be actual, visible and exclusive' অর্থাৎ বাস্তব, দর্শনযোগ্য এবং একান্ত নিজস্ব। যা হিন্দুরা প্রমাণ করেছে। মুসলমানরা পারেননি।

এছাড়াও বাবরি ধাঁচার ধ্বংসাবশেষের গভীরে খনন করে যেসব পুরাতাত্ত্বিক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তাতেও প্রমাণিত হয়েছে, পুরাতাত্ত্বিক উপাদানগুলি কোনওভাবেই ইসলামি স্থাপত্যশিল্পের পরিচয়বাহী নয়। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের রায় হলো 'Mulsims can't assert right of adverse possission.'

সামগ্রিকভাবে, রামজন্মস্থান-বাবরি মসজিদ বিতর্কের শেষ ফলাফল পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট যে এই রায়ের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়ে গিয়েছিল বহু আগেই সেই ১৯৩৮ সালে শহিদগঞ্জ মসজিদ মামলায় এবং প্রায় একইরকম ঘটনায় অযোধ্যার ক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে প্রায় সমসুরেই।

এ এক অদ্ভুত আইনি সংযোগ যা হয়তো সাধারণ মানুষের স্মৃতি বা কল্পনাতেও স্থান পায়নি। কিন্তু বাস্তবে ঘটল সেটাই। তখন এই রায় প্রমাণ করেছে (ভারতীয় আইন অনুসারে), ১৯৪৯ সালে হিন্দুরা জোর করে মসজিদ দখল করে কোনও অন্যায় করেননি এবং তারপর থেকে টানা পুজার্চ্চনাও চালিয়ে গেছেন যে বিশ্বাসের জোরে, তাও প্রমাণ করে দিয়েছে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে আসা নিদর্শন সমূহ। একথাও প্রমাণিত ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধাঁচা ভেঙে দিয়ে করসেবকরা সেই শহিদগঞ্জের মসজিদ ধ্বংস করার ইতিহাসকেই পুনর্জীবিত করেছিলেন হয়তো আজান্তেই। তা না হলে কোনোদিনই পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্য চালানো যেত না বিতর্কিত স্থানে এবং উঠে আসত না প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য যে মসজিদ বানানো হয়েছিল কোনো হিন্দু কাঠমো ভেঙেই। এমন অপকর্মের অজস্র প্রমাণ রেখে গেছেন সম্রাট আওরঙ্গজেব যেগুলির উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হিন্দু জনগোষ্ঠী।

তথ্য ঋণ :

ভারতবর্ষ বনাম ইন্ডিয়া : অমলেশ মিশ্র
(দে পাবলিকেশনস্)

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে হিন্দু, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুস্থানের জয়

করুণা প্রকাশ

১৯৮৪ সালে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে প্রথম ধর্মসংসদ বসেছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়েকজন প্রমুখ সন্ন্যাসীকে নিয়ে আমি ওই ধর্মসংসদে গিয়েছিলাম। সারাদেশ থেকে আগত সাধুসন্ন্যাসীরা সেই ধর্মসংসদে শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের ঘোষণা করেন। তখন থেকে ২০১৮ পর্যন্ত শ্রীরাম জন্মভূমি বিষয়ে যত আন্দোলন, জাগরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেসবগুলিতে আমার সক্রিয়ভাবে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে।

দিল্লির ধর্মসংসদের কিছুদিন পরে প্রয়াগে কুম্ভমেলার আয়োজন হয়েছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে কুম্ভমেলায় আগত বিশাল সংখ্যায় উপস্থিত বিভিন্ন মত-পন্থ-সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের সহমতে জন্মভূমি আন্দোলনকে সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার যোজনা তৈরি হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন, আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। স্থানে স্থানে বড়ো বড়ো জনসভার মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামের জন্মস্থানের ইতিহাস এবং বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংস হওয়া মন্দিরকে পুনরুদ্ধার করার সংকল্প দেওয়ার কাজে সন্ত সমাজ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে অন্যতম গোরক্ষপীঠের মহন্ত অবৈদ্যনাথজী মহারাজ। শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাস গঠিত হলে মহন্ত অবৈদ্যনাথজী এই ন্যাসের প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। দেশের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসী এই আন্দোলনের সফলতার জন্য আশীর্বাদ প্রদান করেন। তার মধ্যে অন্যতম পূজ্যপাদ স্বামী দেওরাহা বাবা। তিনি এই কুম্ভে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বামদেবজী

মহারাজ, মহন্ত রামচন্দ্র পরমহংসজী, পেজাবর পীঠাধীশ্বর স্বামী বিশ্বেশতীর্থজী, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দজী সরস্বতী মহারাজ প্রমুখ।

কুম্ভমেলা থেকে এই আন্দোলনের সংবাদ সম্পূর্ণ দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ধর্মপ্রাণ হিন্দু হৃদয়ের সুপ্ত চেতনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে থাকল। ১৫২৮ থেকে যে সংঘর্ষ হিন্দু সমাজ নিরন্তর করে আসছিল এখন তা নতুন রূপে প্রকাশ পেল।

শ্রীরাম জানকী রথযাত্রার মাধ্যমে শ্রীরাম জন্মভূমি আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সার্বজনিক রূপে দেখা দিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে এক ব্যাপক হিন্দু জনজাগরণের সূত্রপাত ঘটল। শ্রীরাম জানকী রথযাত্রার অভূতপূর্ব সফলতার পর জন্মভূমির তালা খোলার জন্য আন্দোলন শুরু হলো।

তথাকথিত গম্বুজের নীচে যেখানে রামলালা বিরাজিত ছিলেন সেখানে কে বা কার নির্দেশে তালা বন্ধ থাকত, সেই তালা কখনো খোলা হতো না। ফলে ভক্তদের দূর থেকেই দর্শন এবং পূজা করতে হতো। কেউ ভিতরে যেতে পারত না। স্বাভাবিক ভাবেই এটি হিন্দুদের কাছে অসহনীয় ছিল। জন্মভূমির তালা খোলার আন্দোলন সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে সরকারকে হিন্দু ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের দরজা ভক্তদের জন্য খুলে দিতে হলো। জন্মভূমি আন্দোলনের এটা প্রথম বিজয়।

ধীরে ধীরে এই আন্দোলন সমস্ত দেশে এক ব্যাপক জনজাগরণ ঘটায়। জন্মভূমিকে মুক্ত করার জন্য সমস্ত হিন্দু সমাজ তখন উত্তাল।

এই আন্দোলনের ঢেউ তখন কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকল না। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিবেশী দেশ নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা-সহ সুদূর ইংল্যান্ড, আমেরিকা,

ইউরোপ-সহ বিভিন্ন দেশের হিন্দুদেরও সমান ভাবে উদ্বেলিত করল। তারাও এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীরাম জন্মভূমির ভব্য মন্দির তৈরির নকশা প্রস্তুত হয়েছে। সারা দেশে হিন্দুদের ঘরে ঘরে তা পৌঁছে গেছে। হিন্দু তার আরাধ্য ভগবান শ্রীরামের জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের জন্য ব্যাকুল।

এরপর শ্রীরামশিলা পূজন কার্যক্রমের ঘোষণা হলো। এ এক অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিক কার্যক্রম। গ্রামে গ্রামে অযোধ্যা থেকে আগত শ্রীরামশিলার পূজা হবে এবং মন্দির নির্মাণের জন্য ১.২৫ পয়সা দক্ষিণা দেওয়ার আহ্বান করা হলো। সেই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা মন্দিরের জন্য পাথর কেটে নকশা করা সহ অন্যান্য কাজ হবে। সারা দেশে প্রায় ৩ লক্ষাধিক গ্রামে শ্রীরাম শিলার পূজা হয়ে অযোধ্যা পৌঁছায়।

শ্রীরামশিলা পূজন শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকল না। বিদেশের বিভিন্ন দেশের হিন্দুরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শিলা পূজন করে অযোধ্যা নিয়ে এসেছেন তাদের প্রভু শ্রীরামের ভব্য মন্দির নির্মাণের জন্য।

এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে তখন বাম শাসন চলছে। তারা এই শিলাপূজনের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপ্রাণ হিন্দু নির্ভীক চিত্তে প্রচণ্ড বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে গ্রামে গ্রামে শিলা পূজন করে সম্মানের সঙ্গে অযোধ্যা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। কাজটা খুব সহজ ছিল না। অনেক স্থানে সংঘর্ষ হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাতে শিলা অযোধ্যা না পৌঁছাতে পারে তার সব রকমের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় হিন্দু জনমানসের কাছে নতি স্বীকার করে সরকারকে পিছু হঠতে হয়।

শিলাপূজনের পর অযোধ্যায় ভূমিপূজনের অনুষ্ঠানও এক ঐতিহাসিক কার্যক্রম। শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির নির্মাণের জন্য শ্রীকামেশ্বর চৌপাল (বিহার) তথাকথিত পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি রূপে ভূমিপূজন করেন।

বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভাবে জন্মভূমির আন্দোলন ক্রমশ আরও তীব্র ও গতিশীল হতে থাকল। শ্রীরাম পাদুকা পূজা, শ্রীরাম জ্যোতি যাত্রা, শ্রীরামরক্ষা সূত্র বন্ধন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরন্তর আন্দোলন গতিবৃদ্ধি হলো। কিন্তু প্রশাসনের উপেক্ষায় হিন্দুদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছিল। জন্মভূমি আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সাধু-সন্তগণ করসেবার আহ্বান জানালেন। প্রথম করসেবা হয় ১৯৮৯ সালে। অনুরূপ ১৯৯০-এ করসেবায় লক্ষাধিক করসেবক সারা দেশ থেকে অযোধ্যা অভিমুখে রওনা হলো। উত্তরপ্রদেশে তখন মুলায়ম সিংহের সরকার। তিনি ঘোষণা করলেন যে অযোধ্যায় কোনো করসেবককে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ফলে রামভক্ত করসেবকদের উপর দমন পীড়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। সম্পূর্ণ উত্তরপ্রদেশ জেলখানায় পরিণত হয়। মুলায়ম সিংহ ঘোষণা করেছিলেন যে অযোধ্যায় করসেবক তো দূরের কথা একটি পাখিও প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু মুলায়ম সিংহের আস্ফালনকে বিফল করে রামভক্ত করসেবক লক্ষাধিক সংখ্যায় প্রবেশ করে সেই বিতর্কিত ধাঁচার ওপরে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করে। এ এক হিন্দুর বিজয়ের দিন। হিন্দু শৌর্য পরাক্রমের দিন। হিন্দুর নতুন ইতিহাস রচনার দিন। কিন্তু এর জন্য হিন্দু সমাজকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অনেক করসেবকের প্রাণ বলিদান হয়েছে। বর্বর মুলায়ম সিংহ সরকারের পুলিশ নিশস্ত্র করসেবকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়, ফলে অনেক করসেবক হতাহত হয়। অনেক করসেবকের মৃতদেহ সরযূনদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। অনেক করসেবকের আজও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় কলকাতার দুই বীর ভাই রাম কোঠারী এবং শরদ কোঠারী পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। এই ঘটনায় সারা দেশ শোকস্তব্ধ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এত কিছু সত্ত্বেও কিন্তু আন্দোলনের গতি থেমে থাকেনি। ভগবানের জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণের আন্দোলন দিন প্রতিদিন আরও তীব্র রূপ ধারণ করেছে। অবশেষে আসে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২। সেদিন ছিল গীতা জয়ন্তী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজকের দিনেই কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গণে তাঁর ভক্ত, সখা, সুহৃদ অর্জুনকে গীতার উপদেশ শুনিয়েছিলেন।

এদিন সারাদেশ থেকে আগত করসেবকরা হিন্দু সমাজের উপর গত ৪৫০ বছর ধরে যে কলঙ্ক চিহ্ন ছিল তা কেবল ৫ ঘণ্টায় মুছে ফেলে। ১৫২৮ সালে বাবরের সেনাপতি মির বাঁকি ও তার সেনা অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামের মন্দিরকে কামানের গোলায় ধ্বংস করে। যদিও তখন হিন্দুরা প্রতিরোধ করেছিল কিন্তু কামানের গোলার সামনে শত চেষ্টা করেও তারা তাদের প্রভুর মন্দির সেদিন রক্ষা করতে পারেনি। তারপর থেকেই জন্মভূমিকে দখলমুক্ত করার জন্য হিন্দু সমাজের সতত সংঘর্ষের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। হিন্দুর হৃদয়ে যে সঞ্চিত ক্ষোভ-আক্রোশ ছিল আজকের দিনে করসেবকদের দ্বারা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। সারা বিশ্ব হিন্দুদের এই নতুন পরাক্রমী রূপ দর্শন করে বিস্মিত ও অভিভূত। কারও সহযোগিতা, কৃপা, অনুকম্পা, দয়ায় নয়, হিন্দু নিজ পরাক্রমের দ্বারা এই বিজয় লাভ করল। হিন্দু সমাজ আজ নির্ভীক ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সমগ্র বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করল। বিদেশি-বিধর্মী আক্রমণকারীদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে কোটি কোটি হিন্দুর আরাধ্য ভগবান শ্রীরাম (রামলালা) সম্মানের সঙ্গে তার জন্মভূমিতে অস্থায়ী তাঁবুতে বিরাজিত হয়েছেন। ভক্তগণ তার পূজা অর্চনা শুরু করেছেন।

এত কিছুর পরও কিন্তু অযোধ্যায় শ্রীরামের জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়নি। রামলালা অস্থায়ী ছাউনিতে বিরাজিত থেকেছেন। শীত-গ্রীষ্ম, রোদ-বৃষ্টির মধ্যেই প্রভু শ্রীরামকে থাকতে হয়েছে। রাজনীতি, তুষ্টিকরণ, আইনি মারপ্যাঁচ মন্দির নির্মাণের পথকে বিলম্বিত করেছে। কোর্টের নির্দেশে সরকার রেডার সার্ভে করে জন্মভূমির নীচের স্থিতি জানার চেষ্টা করে জানতে পারে যে সেখানে মন্দিরের অবশেষ এখনও বর্তমান। পরবর্তীকালে আরও তথ্য জানার জন্য এএসআই-এর মাধ্যমে জন্মভূমিতে উৎখননের ফলে সেখানে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, দেব-দেবীর মূর্তি, ঘণ্টা, শিলালেখ ইত্যাদি নিদর্শন পাওয়া যায়। এর পরেও জন্মভূমিকে হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। প্রায় ৪০ বছর কোর্টে মামলা চলার পর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ কোর্ট নির্ণয় দেয় যে এই স্থানই ভগবান শ্রীরামের জন্মভূমি যা এতদিন হিন্দুরা মেনে এসেছে। কোর্ট একথা স্বীকার করে নিলেও জন্মভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করে এক অংশ শ্রীরামজন্মভূমি আর এক অংশ নির্মোহী আখড়া, এক অংশ মুসলিম ওয়াকফ বোর্ডকে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। স্বাভাবিক ভাবে জন্মভূমির এই ভাগ বাটোয়ারা কারোরই স্বীকার্য ছিল না। ফলে সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি শুরু হয়। জন্মভূমিতে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই অধিকার, সেই জমির প্রকৃত মালিক রামলালা।

দীর্ঘকাল অনেক টালবাহানার পর গত ৯ নভেম্বর ২০১৯-এ বহু প্রতিক্ষিত রামমন্দিরের পক্ষে রায় আসে। লক্ষ লক্ষ রামভক্তের বলিদান আজ সার্থক হলো। শ্রীরামের জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণের সকল বাধা দূর হলো। রামলালাকে আর তাঁবুতে থাকতে হবে না। দ্রুত মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হলো। হিন্দুর বিজয় হলো। হিন্দু, হিন্দু সমাজ ও হিন্দুস্থানের জয় হলো।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বতন কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা)

‘সশক্তিক নমি তব পদে’

স্বপ্না কুণ্ডু

ওঁ যথাগ্নেদার্হিকাশক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং ত্বাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের সমুদ্রকে আশ্রয় করে সারদেশ্বরী শ্রীশ্রীমায়ের চিরন্তন সুমধুর দৈবী ও মানবীলীলা। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ এবারের নরলীলায় রেখে গেলেন তাঁর লীলাসঙ্গিনী ভালোবাসার মূর্তপ্রতীক শ্রীমাকে। ঠাকুরের আবির্ভাব সর্বধর্ম সমন্বয় সাধন, আর শ্রীমার প্রকাশ থাকল কর্মের সমন্বয়সাধন। ত্যাগ, তিতিক্ষা, সততা, সত্যনিষ্ঠা, মমতা মানবপ্রেমের সার্থক মেলবন্ধন পরমাপ্রকৃতি মাজননী। সংসারলীলার সবটুকু হলাহল পান করে আমাদের পরম শান্তির অমৃতবারিতে সিঞ্চিত করেছেন। লোকশিক্ষার্থে শ্রীমা নির্বিকার প্রশান্তিতে তাঁর দৈবী ও মানবীসত্তাকে আচার-আচরণের মাধ্যমে, ধর্ম, জাতপাত, অশুচি, ভাষা ইত্যাদি সর্ববাধা বিঘ্নের বেড়াজালে সরিয়ে অফুরন্ত মাতৃস্নেহে লালন করেছেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের গুরুশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর জীবোদ্ধার ব্রত শিবজ্ঞানে জীব সেবা করার সকল কাজ মায়ের ওপর অর্পণের পটভূমি রচনা করেছিলেন কাশীপুরে; তাঁর শেষ অঙ্গনকে কেন্দ্র করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আদর্শের সার্থক রূপায়ণে মা বললেন, ‘সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি। দুলে, বাগদি, ডোমের মাঝেও তিনি— তবে তো মনে দীনভাব আসবে।’ সকল ভক্ত, ত্যাগীসন্তান, গৃহস্থদের মা একইসঙ্গে সন্তান ভাবে আর নারায়ণরূপে পালন করেছেন। শ্রীমায়ের আবির্ভাবের পটভূমিকাটি ছিল দেড়শো বছরেরও বেশি আগের বঙ্গদেশ বিশেষত তাঁর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রাম জয়রামবাটী। প্রতি পদে গ্রাম্য দলাদলি, আচার সর্বস্ব জাতপাত, ছুঁতমার্গের জীবন সেখানে। এই অসম পরিবেশে অকুতোভয় ব্যক্তিত্বময়ী মা মহিমান্বিত বাণীতে আমাদের দিয়েছেন এক আশ্চর্য ধর্মসমন্বয়ের শিক্ষা, ‘‘আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, আমজাদও তেমন ছেলে।’’ সংসারে সকল কাজে মাকে সাহায্য করেছেন, ছোটো ভাইদের মাতৃস্নেহে বড়ো করেছেন, পরবর্তীকালে নহবতে ঠাকুরের মাকে পরম মমতায় সেবা করেছেন, পতিব্রতা স্ত্রীরূপে ঠাকুরের সকল কাজের কাণ্ডারি হয়েছেন, নহবতের একচিলতে ঘরে একান্তে বসে তিনি আনন্দিত চিত্তে রান্না করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও ত্যাগী সন্তানদের জন্য; নরেন, রাখাল সকলের আবদার মিটিয়েছেন হাসিমুখে, সযত্নে, সস্নেহে ও ভালোবাসায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ‘‘ও কী যে সে? ও আমার শক্তি। ও সারদা-সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে। এবারে রূপ ঢেকে এসেছে।’’ মায়ের সংস্কারমুক্ত চেতনায় বিদেশিনী নিবেদিতা হয়েছেন পরম আদরের খুকি। শ্রীঠাকুরকে নিবেদিত নিবেদিতার প্রসাদ গ্রহণ করেছেন, নিজের গ্রামে এমনকী সুদূর ব্যাঙ্গালোরে নীচজাতির ব্যক্তিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন, শুচিবাই বর্জন করেছেন, এভাবেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদার আদর্শটিকে তুলে ধরেছেন জগৎ মাঝে। ভোগসর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক গৃহস্থকে জীবনবোধ জাগাতে শ্রীমা নিজের আচরণ ও উপদেশ দিয়ে পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও জীবনযন্ত্রণার সমাধান করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার কর্মজগৎ, মেয়েদের স্কুল, সমাজে মেয়েদের অবস্থার উন্নতিসাধন সবেতেই ছিল মায়ের আন্তরিক উৎসাহ। বাগবাজারে নিবেদিতার বিদ্যালয়ের উদ্বোধনে এসে মায়ের মঙ্গলকামনা— ‘‘এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ যেন বর্ষিত হয় এবং এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে। নিবেদিতার দৃষ্টিতে মাতাদেবী সহস্র কাজের মাঝেও কী নির্লিপ্ত, আত্মমগ্ন, অনাড়ম্বর সহজতম কাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে নারীজাগরণের সূচনা করলেন দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী কালিকাপূজার দিনে শ্রীমাকে আসনে বসিয়ে ষোড়শী পূজার মধ্য দিয়ে। তাঁকে অভিষিক্ত করে দেবীর বোধন করলেন প্রণামমন্ত্রে, ‘‘হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিকারী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এর (শ্রীমার) শরীর মনকে পবিত্র করে এতে আবির্ভূতা হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।’’ পূজাশেষে মায়ের পদতলে জপমালা-সহ নিজের সব সাধনার ফল অর্পণ করলেন।

শ্রীমা সারদা তাঁর নিত্যদিনের কাজের মাঝে আমাদের জন্য রেখে গেছেন মণিমুক্তার মতো অজস্র অমৃত মথিত বাণী, যার অন্তঃর্নিহিত

অর্থ মর্মস্পর্শী, সংসারে চলার পাথেয়, অপার শান্তিদায়ক কল্যাণকামী। নারী-পুরুষ, গৃহী -সন্ন্যাসী, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত সকলের জন্যই তাঁর পথনির্দেশিকা নির্ঘোষে উচ্চারিত অভয় মন্ত্রধ্বনি। শিক্ষা দিলেন আমাদের নির্বাসনা হতে, সকল চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে মনকে শুদ্ধ মোহমুক্ত আসক্তিশূন্য হতে। বললেন— সংসারে কামনা বাসনাই যত দুঃখের কারণ। কেউ উঠান পরিষ্কার করে ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে মা বলতেন, সংসারে যার যা মান্যি তাকে সেটি দিতে হয়। বলতেন স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ, যার আছে ভয় তার হয় জয়। সর্বংসহা মা সারদা শেখালেন পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই, তার ওপর কত অত্যাচার হচ্ছে অবাধে সব সইছে। আধুনিক বিশ্বে এত হানাহানি, ক্রূরতা, বৈরিতা, হিংসা, মানুষে মানুষে বিভেদের মাঝে মায়ের বাণীই অন্ধকারে আলোর দিশা। ষড়রিপুর তাড়না থেকে মুক্তির পথ— ''সন্তোষের সমান ধন নেই আর সহ্যের সমান গুণ নেই।'' জীবনের অন্তিমবেলায় আমাদের পারমার্থিক, সাংসারিক শান্তির জন্য উচ্চারণ করলেন তাঁর অমোঘ বাণী, ''যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা সকলে আপনার।'' উপনিষদের বাণীকে সরলতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে আমাদের অন্তরাত্মাকে জানালেন, সর্বভূতে ব্রহ্ম, এক ব্রহ্ম ঈশ্বর হতেই সকল জীবের প্রকাশ। সেই ব্রহ্মে মন স্থির হলে আর কারো দোষ দেখার কথা মনে আসে না। মনে থাকে শুধুই অপার আনন্দ। শ্রীমার হৃদয় সর্বদা দিব্যআনন্দে পরিপূর্ণ থাকত। চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমাদের মা নিষ্কলুষ মালিন্যহীন, অপাপবিদ্ধা। মায়ের ভারী স্বামী সারদানন্দের দৃষ্টিতে, 'মার মহিমা, মার শক্তি কত আমাদের সাধ্য কী বুঝি। তাঁর এমন আসক্তিও দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি।''

মায়ের প্রতি নিবেদিতা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সারদা মাকে লেখা একটি চিঠিতে, ''প্রিয় মা, তুমি ভালোবাসাময়, সে ভালোবাসা আমাদের এই জগতের ভালোবাসার ন্যায় উদ্দাম ও উত্তেজনাপূর্ণ নয়। তা শুধু একটা শান্ত শান্তি, যা সকলের কল্যাণসাধন করে, কারও অমঙ্গল করে না। এ একটা দিব্য বিকিরণ, সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি। ভগবানের সমস্ত বিস্ময়কর বস্তুই নীরব। নীরবে সকলের অলক্ষ্যে, আমাদের জীবনে প্রবেশ করে— বাতাস, সূর্যকিরণ, গঙ্গার মাধুর্য। এই নীরব জিনিসগুলি তোমারই মতো।''

শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল মাতৃভাব ও সন্তানভাব। অর্থাৎ অতি শুদ্ধভাব। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, শক্তিরূপিণী মা সারদা সর্বভূতে 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা', চিরন্তন সেই মাতৃভাবকে পূর্ণভাবে জাগরিত করেছেন তাঁর নিত্যকারের আচরণে। তাঁর স্বগত উক্তি তিনি সতেরও মা, অসতেরও মা। সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়— সত্যজননী। তিনি আমাদের ক্ষমারূপা তপস্বিনী, গণ্ডিভাঙা মা, দয়াময়ী মমতাময়ী জগত কল্যাণকাঙ্ক্ষী জননী। স্মরণ করি তাঁর সেই অক্ষয় আশীর্বাদ ''যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানকে জানিয়ে দিও আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপরে আছে।''

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ মার কথা বলেছেন, 'মা-ঠাকরুণ যে কী বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেউ পার না— ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মা ঠাকুরানি ভারতে পুনরায় মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা। উপরে মহাশান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহার মূর্তি।' মাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীমঠ স্থাপনে করা তাঁর স্বপ্ন ছিল, তারই বাস্তবরূপ আজকের সারদামঠ। ১৮১৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের জন্য বলরাম বসুর বাড়িতে যে সভা হয়েছিল তাতে উপস্থিত ত্যাগী গুরুভাই ও গৃহীভক্তদের সম্বোধন করে স্বামীজী বলেছিলেন, 'শ্রীমা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী বা আমাদের গুরুপত্নী নন। আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে তিনি তাঁর রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী। আমাদের সঙ্ঘজননী।' শ্রীশ্রীমায়ের আদেশই ছিল তাঁর কাছে শেষকথা। স্বামীজীর মনে কোনো সমস্যা হলে মায়ের কাছে যেতেন সমাধান খুঁজতে। আমেরিকার বিশ্বধর্মসম্মেলনে যাবার আগে তিনি সর্বপ্রথম মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন এবং মায়ের আশীর্বাদেই বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ হয়ে দেশে ফেরেন। বেলুড়মঠে সঙ্ঘের জন্য জমি কিনে স্বামীজী মায়ের নামে সংকল্প করে জমি ঠাকুরের নামে পরমানন্দে উৎসর্গ করলেন। আবার কলকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে সেবাকাজ চালানোর জন্য বিচলিত স্বামীজী মঠের জমি বিক্রি করে দিতে চাইলে দৃঢ়প্রত্যয়ী, দূরদৃষ্টিসম্পন্না মা বুঝেছিলেন সঙ্ঘ থাকলে তবেই আগামীতে ঠাকুরের অনন্তভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, জনহিতকর কাজ হবে। তাই বললেন, ''বাবা, বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই শেষ হয়ে যাবে?'' স্বামীজী তখন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। ১৯০১ সালে মঠে স্বামীজী মায়ের নামে সংকল্প করে দুর্গাপূজা করে মায়ের স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের বীজ বপন করেছিলেন আর ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা মা তাঁর ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা দিয়ে মঠকে ঠাকুরের নির্দেশিত শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে সাধনা ও সিদ্ধির পথে পরিচালিত করেছেন। জোসেফিন ম্যাকলাউড মায়ের (জয়া) মা'র কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ''আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে মা রেখে গেছেন আগামী তিন হাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে তারই আদর্শ।'' মায়ের পায়ে প্রণতি জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, ''মা, এইটুকু জানি তোমার আশীর্বাদে আমার মতো অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দের জন্ম হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে একটিই আর দ্বিতীয়টি নেই।'' বিবেকানন্দের অনুভবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা একই শক্তির দুই প্রকাশ। তাই বন্দনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'গাই গীত শোনাতে তোমায়'— 'দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তবপদে'। মা অবোধ আমরা, তমসায় আচ্ছন্ন মন আমাদের, দুঃখ, তাপক্লিষ্ট অশান্তময় জীবনের তোমার করুণাধারায় স্নিগ্ধ করো, নির্মল করো, জ্ঞান-বিবেক বোধ-বুদ্ধির আলোয় আলোকিত করে তোমার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় দান কর।

তথ্যসূত্র :

১. জন্মজন্মান্তরে মা : সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা। প্রকাশিকা : শ্রীসারদা মঠ দক্ষিণেশ্বর। ১ম সংস্করণ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩।

১. শতরূপে সারদা : সম্পাদক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। রামকৃষ্ণমিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক। ১ম প্রকাশ ১৩ অক্টোর ১৯৮৫।

(শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ভারত মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর

অসিত কুমার সিংহ

রাজা পরীক্ষিতের বংশধর সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়েন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ঘোড়া কপিল মুনির আশ্রমে বেঁধে দেন। সগর রাজার পুত্ররা সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে মুনির আশ্রমে ঘোড়া দেখে মুনির আশ্রম ভাঙচুর করে। মুনির ধ্যান ভেঙে যায়। মুনির ক্রোধাগ্নিতে রাজার পুত্ররা, সৈন্যসামন্তরা ভস্মীভূত হয়ে যায়। রাজার আর এক বংশধর অংশুমান ঘোড়া খুঁজতে বের হন। তিনি মুনির আশ্রমে ঘোড়া দেখে মুনিকে ঘোড়া ছেড়ে দেওয়ার প্রার্থনা জানান। মুনি ঘোড়া নিয়ে যাবার আদেশ দেন। এরপর অংশুমান তার বংশধরদের উদ্ধারের প্রার্থনা জানান। মহামুনি পবিত্র গঙ্গার জলেই বংশধরদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে বলেন। অংশুমান তপস্যা করতে করতে স্বর্গলাভ লাভ করেন।

এরপর তাঁর পুত্র ভগীরথ কঠোর তপস্যায় গঙ্গাদেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন। দেবীর তার প্রচণ্ড গতিবেগ ধরে রাখার জন্য মহাদেবের তপস্যা করতে বলেন। ভগীরথ আরও কঠোর তপস্যায় দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেব জটায় গঙ্গাদেবীর প্রচণ্ড গতিবেগ ধারণ করার কথা বলেন। ভগীরথ শঙ্খ বাজিয়ে শিবের জটার মধ্য থেকে গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যে আনেন। কী বিপদ! গঙ্গা প্রবাহে জহ্নুমুনির আশ্রম ভেসে যায়। মুনি রাগে গঙ্গার প্রবাহকে রুদ্ধ করে রাখেন। ভগীরথ মুনির স্তবস্তুতি করেন। জহ্নুমুনি সন্তুষ্ট হয়ে নিজের জানু থেকে গঙ্গার ধারা প্রবাহ মুক্ত করেন। এখানে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী। ভগীরথ মকর সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাকে কপিলধামে আনয়ন করে সমুদ্রে মিলিত করেন এবং বংশধরদের শাপ মুক্ত করেন। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের জন্য গঙ্গার নাম হয় ভাগীরথী। আর কপিলধাম হয়ে যায় ভারত মহাতীর্থ।

'নমস্তভ্যং ভাগবতে বিশুদ্ধে পাপনাশিনী পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী ভাগীরথী মোক্ষদে গঙ্গে গঙ্গৈব পরমাগতি নমস্তে নমস্তে, প্রণতি ভারতী।' হিমালয় থেকে বারাণসী-কলকাতা-হাওড়া হয়ে দক্ষিণে গঙ্গাসাগর কপিলধাম প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে পবিত্র অনুভূতি জাগায়। মীরারানির কথায় 'চলমান গঙ্গাসাগর তীর, গঙ্গাসাগর নির্মলপানি পবিত্র করয়ে শরীর।' প্রতিবছর ৮ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি, কপিলধাম গঙ্গাসাগর মেলায় সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্স, রেড ক্রস, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু মহাসভা, হিন্দু সৎকার সমিতি, সিটিজেন ভলেন্টিয়ার, ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, লোকনাথ মিশন, ইসকন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি একশোটি সংস্থা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের সবরকম সহযোগিতায় মানব সেবা শিবিরের আয়োজন করে।

কপিলধামে হিন্দু সৎকার সমিতির মানব সেবা শিবিরের বিশেষ আকর্ষণ কপিল ধামে পরিবেশ সচেতনতা কার্যক্রম, বিবেকানন্দ জন্ম জয়ন্তীতে মহাভোজ, ভারত সংস্কৃতি ঐতিহ্যের সঙ্গমস্থল গঙ্গাসাগর শীর্ষক আলোচনা, হিন্দু সাহিত্যে আধুনিক রূপ বৈচিত্র্য শীর্ষক আলোচনা, সাহিত্যে সংগীতে চলচ্চিত্রে গঙ্গাসাগর শীর্ষক আলোচনা প্রভৃতি মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান।

এবছর মকর সংক্রান্তির পূর্ণস্নান ১৫ জানুয়ারি দুপুর ১ টা থেকে ৩ টা, মোক্ষস্নান রাত্রি ৮ টা থেকে রাত্রি ১০-৩০ মিনিট। যাতায়াত কলকাতা, হাওড়া থেকে বাসে লট ৮, সেখান থেকে ভেসেল বার্জ লঞ্চে কচুবেড়িয়া, সেখান থেকে বাসে গঙ্গাসাগর কপিলধাম রোড নং ১ অথবা রোড নং ২ অথবা রোড নং ৩ অথবা রোড নং ৪, অথবা রোড নং ৫। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেন কাকদ্বীপ অথবা নামখানা, সেখান থেকে লঞ্চে চেমাগুড়ি, সেখান থেকে বাসে কপিল ধামে রোড ১, ২, ৩, ৪, ৫ আসতে হয়। গঙ্গাসাগর মেলায় সবাইকে সপরিবারে স্বাগত। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

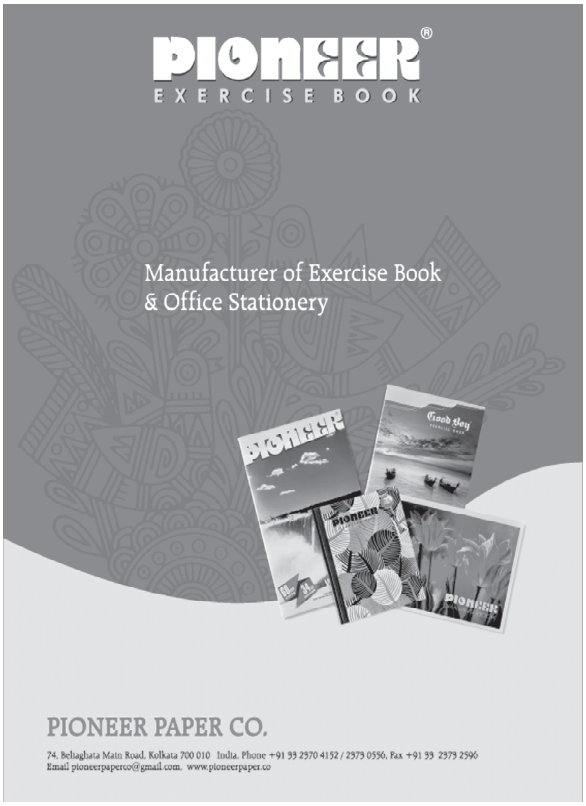

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

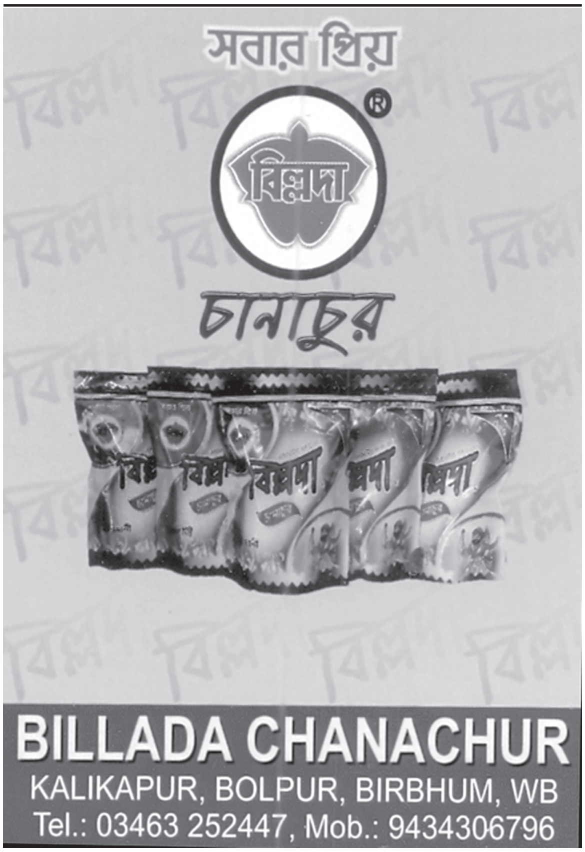

শিকার

বরুণ দত্ত

রায়সাহেব এই সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী। তাঁকে বাদ দিয়ে কেউ সুখ পেতে পারে না, এড়াতে পারে না দুঃখও।

রায়সাহেবের অতি বিশ্বস্ত রতন আজও তার রুটিন মতো গোরুর পাল নিয়ে চলেছে শীতলগাঁ থেকে নয়াপোতা বর্ডারে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে বিশাল প্রান্তরের বুক চিরে কোনাকুনি চলে যাওয়া এই মেঠো পথে সাধারণ মানুষের তেমন যাতায়াত নেই। বিশেষ করে রাতের এমন তৃতীয় যামে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে যেন আশপাশের আমবাগানগুলো।

প্রতিদিনই প্রায় বিভিন্ন খবর-কাগজের পাতায় সংবাদ থাকে নিরীহ প্রাণী গোরু সম্বন্ধে। সীমান্তরক্ষীরা কতগুলি গোরু আটক করেছে, সীমান্তে ক'জন পাচারকারী গুলিবিদ্ধ হয়েছে, ক'জন ধরা পড়েছে জালনোট বা সোনার বাট নিয়ে। থাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কথা। তবে সবার ওপরে স্থান পায় গোরু পাচারের কথা-কাহিনি। পাঠকরা এখন এসবে তেমন গুরুত্ব দেন না। ভাবেন, ধুর্, এতো নিত্যকার ধারাপাত! চাল ডাল তেল নুন কেরোসিন আলু পেঁয়াজ সাবান টুথপেস্ট— কী নেই এ তালিকায়? তা হলেও গোরু থাকে সবার ওপরে। রোজই পাচার হয় যে পাল পাল গোরু! তাই এত গুরুত্ব এই অবলা জীবের।

নিরীহ এই প্রাণীদের বিনা ঝঞ্ঝাটে সীমানা পার করে দিতে পারাটাই আসল ব্যাপার। বহুদিন আগে থেকেই যা শিল্পের তকমা পেয়েছে। যেখানে কোটি কোটি টাকার দৈনন্দিন লেনদেন, সেটি অবশ্যই শিল্প। তাকে 'পাচার' আখ্যা দিয়ে হেয় করটা ঠিক নয়। রসিকতা করে বলেন কেউ কেউ।

মালিকের পাঠানো গোরুর সংখ্যার সঙ্গে রতনরা সুযোগ পেলে মাঠে চরতে থাকা রাখাল-ছাড়া গোরু একটা দুটো খুব সহজেই নিজের গোরুর পালের মাঝে ঢুকিয়ে নেয়। এটা তাদের বাড়তি আয়। তাই পাচারকারীর সঙ্গে 'গোরুচোর' কথাটাও যুক্ত হয়েছে বহুদিন।

সীমান্তে বাস, ভাবনা বারো মাস। যখন তখন মাঠ-ঘাট, এমনকী গৃহস্থের গোয়াল থেকেও রাতের অন্ধকারে গোরু চুরি হয়ে যাওয়াটাও সীমান্তের বড়ো উপদ্রব। ডাকাত পড়লে তো আর কথাই নেই, গোরু-বাছুর-সহ সর্বস্ব লুটে নিয়ে পালিয়ে যায় ওপারে।

রতনদের দিকের পয়েন্টের নেপথ্য নায়ক মহামান্য শ্রী বিশ্বরূপ রয়ে ওরফে রায় সাহেব। চেহারায় পোশাকে, মার্জিত সহাস্য ব্যবহারে, বাক্‌চাতুর্যে, সীমাহীন অর্থ সম্পদে রায় সাহেব মুকুটহীন রাজা। তাঁকে সমীহ করে অনেকেই, ত্রাস ভাবে আরও বেশিজন।

এই শীতলগাঁ— নয়াপোতা পয়েন্টে রতন একা নয়। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আরও অনেক রতন আছে। তাদের মুখাপেক্ষী বহু পরিবার-পরিজন। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা অন্তত কয়েক হাজার তো হবেই।

রতন তার কর্মদক্ষতায় স্থান করে নিতে পেরেছে রায় সাহেবের বিশ্বস্তজনের তালিকার প্রথমদিকে।

রতন যেদিন একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে সাতচল্লিশটা গোরুর অ্যাসাইনমেন্ট নির্বিঘ্নে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল, সেদিন রায়সাহেব 'ট্রিপ'-এর টাকার উপরে বাড়তি টাকা তো দিয়েছিলেনই, উপরন্তু, মহা খুশিতে রতনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'কামাল করেছিস রতন। পথ-ঘাট ভালো ছিল না, বর্ডারও গরম ছিল, ফিরতে তোর অত দেরি দেখে ভেবেছিলাম, আমার আম আর ছালা দুইতো গেলই তুইও ভোগে গেছিস।...তুই ফিরে আসায় কী যে নিশ্চিন্ত আর খুশি হয়েছি, তোকে বলে বোঝাতে পারব না।...সাবাস রতন। নে, সিগারেট ধরা' বলতে বলতে রায়সাহেব তার সোনার সিগারেট কেস থেকে বিদেশি লম্বা একটা সিগারেট আর লাইটার জোর করে তুলে দিয়েছিলেন রতনের হাতে।

হতচকিত হয়ে পড়েছিল রতন, তবু নিতে হয়েছিল রায়সাহেবের এই অভাবিত ও অবিশ্বাস্য উপঢৌকন। রতনের তখনও ঘোর কাটেনি, রায়সাহেব বলে চলেছেন, 'এবার থেকে তোকে আমি অন্য কাজে লাগাবো রতন। এ কাজে পরের ট্রিপটাই হবে তোর লাস্ট ট্রিপ।...'

এমন আরও অনেক কথাই বলেছেন রতনের রায়সাহেব। শুনিয়েছেন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। সেসব শুনতে শুনতে স্বপ্নের ঢেউ ভাঙতে থাকে রতনের মনের তটে। তাহলে, সত্যিই তাকে আর গোরু ছুটিয়ে বেড়াতে হবে না? বিদ্ধ হতে হবে না দু'তিনটে গ্রামের মানুষের তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে!

রায় সাহেব রতনের কাঁধে আশ্বাসভরা হাত রেখে বলেছেন, নতুন কাজে যোগদানের জন্য যথোপযুক্ত পোশাক, ব্রিফকেস ইত্যাদি কেনার জন্য যা টাকা লাগবে তিনিই দেবেন। তারপর আক্ষেপের গলায় বলেছেন, 'তবে, তোর জায়গাতেও তো তেমন লোক চাই? সন্ধান

কর।... আসছেও কেউ কেউ, কিন্তু বাজিয়ে দেখে পছন্দ হচ্ছে না...।'

রতনকে রায়সাহেব যে এমন ভাবে তাঁর 'গুড বুক'-এ রেখেছেন, সেটাই তো রতনের স্বপ্নের অতীত!

রায়সাহেবের কথা যদি ঠিক হয়, তবে রতনের প্রথম কাজই হবে দামি দামি সাবান কিনে, সেই সুগন্ধি সাবান বারবার গায়ে মেখে চান করা। এমনি করেই নিজের শরীর থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলবে গোরুর গায়ের গন্ধ। তারপর, তারপর রায়সাহেবের দেওয়া টাকায় কেনা নতুন পোশাকে সেজে, গায়ে স্প্রে করবে এসময়ের নামি কোম্পানির দামি সেন্ট। ভুলে যাবে অতীত। ফুলবাবুটি সেজে গিয়ে দাঁড়াবে নয়নের সামনে, তখন নিশ্চয়ই আর মুখ ফেরাবে না নয়ন?

ইদানীং নয়নের সঙ্গে আর দেখা হয় না বললেই চলে। যদি কখনও সখনও হয়তো স্টেশনের পথে বা অন্যকোথাও হয়, কেমন একটা দৃষ্টিতে নয়ন তাকায় তার দিকে, থামে না। কথা হয় না একটাও। চলে যায় নয়ন একইভাবে। নয়নের এই অবহেলায় ভালোবাসার পাখিটা অসহায় পাখা ঝপটায় রতনের বুকের মাঝে। রতন তাই ভাবে, কেমন করে এ-পথ ছেড়ে সন্ধান পাবে অন্য পথের? যে পথ গিয়ে মিশবে নয়নের পথের সঙ্গে!

ছোটোবেলার ভালোবাসার কথা রতন ভুলবে কেমন করে? ভোলা কি যায়! বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে দু'জনের পথ বিপরীতমুখী হয়ে গেছে কখন। লেখাপড়া ছেড়ে রতন কীভাবে কখন জড়িয়ে পড়েছে রায়সাহেবের বিছানো অদৃশ্য জালে। আর বেরোতে পারেনি। চায়ওনি হয়তো তেমন করে। রায়সাহেবের দরাজ হাতটাই হয়তো ভুলিয়ে রেখেছে রতনকে।

না, আর নয় লোভের এই চিটে গুড়ে জড়িয়ে থাকা। এ সিদ্ধান্ত রতনের হারিয়ে যায় আবার।

আর কদিন পরেই রায়সাহেবের বিশ্বস্ত রতন শুরু করবে নতুন জীবন— নতুন পদযাত্রা। কথাটা পাকা হবার পর থেকেই রতনের দু'চোখ জুড়ে ভাসছে ওই একই ছবি। আর মুক্তবিহঙ্গের মতো তার বুক ভরে উঠতে থাকে আনন্দের আবেগে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়নকে জানাতে হবে তার এই উত্তরণের কথা। কিন্তু সব শুনে নয়ন যদি আবার বলে, 'এর চাইতে স্টেশন-বাজারে সবজি বিক্রি করো, নয়তো ট্রেনে হকারি করো। তা বরং সম্মানের।'

তাহলে কী করবে রতন? একদিকে রায়সাহেব, অন্যদিকে নয়ন। রায়সাহেবের গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচতে পারবে রতন? রতন জানে, রায়সাহেবের বিরাগভাজন হয়ে কেউ আর বাঁচে না। সে যাইহোক, এবার আর নয়নের কথা ফেলবে না রতন। এপথে, এই কাজে প্রাণ তো সারাক্ষণই পদ্মপাতার জলের মতো টলোমলে। এই কাজে ঢোকা যত কঠিন, তার চেয়ে বেশি কঠিন শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা।

পুলিশ আর বিএসএফ যেমন অস্ত্র উঁচিয়েই আছে, তেমনি আছে প্রতিযোগী অন্য রায়সাহেবদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রতনের মতো কর্মঠ ও বিশ্বস্ত রানারদের উপরে। রতনকে তারা লোভনীয় অফার দিয়েছে কয়েকবার। তা সত্ত্বেও রতন সে ফাঁদে পা দেয়নি লোভের বশবর্তী হয়ে। মালিকের কাছে থেকেছে বিশ্বস্ত। প্রতিপক্ষরা প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে রতনদের মতো রানারদের সরিয়ে দেয় পৃথিবী থেকে। কাজ শেষ হলে লাশটা টেনে কাঁটাতারের বেড়া টপকে ফেলে দেয় ওপারে। এভাবেই ওপারের লাশ আসে এপারে। লাশের দায় নিতে চায় না কেউই।

রাইফেলধারী পাহারাদারদের বুটের শব্দ শুধু একটু স্থান বদল করে। নির্দিষ্ট খুঁটির তলায় রাখা খামটা তুলে নিয়ে তারা সরে যায় কিছুটা তফাতে।

দীর্ঘদিনের পরিচিত পথ, তবু এপথে এলে রতনের কেমন একটা অস্বস্তি হয়। বর্ডার যেদিন বেশি গরম থাকে, সেদিন গোরুর পাল ছুটিয়ে ফিরে আসতে হয় রতনকে। তখন ভোরের আলো সবে ফুটি ফুটি করছে। পশুগুলোর সঙ্গে রতনও হয়ে পড়ে হা-ক্লান্ত। এমন হলে গ্রামের মানুষের চোখে মুখে রতন দেখে খুশির ঝল্‌কানি। বিনা শব্দে তারা বলতে চায়— কেমন জব্দ? গোরু ছুটিয়ে ছুটিয়ে গ্রামের পথঘাট তো মানুষ চলাচলের অযোগ্য করে রাখিস বারো মাস। বেশ হয়েছে, রোজ যেন এমনি করেই ফিরতে হয় তোকে...।'

তবে চোখে মুখে তাদের যতই বিরক্তি আর ঘৃণাই করুক, মুখ ফুটে কোনো মন্তব্য করার সাহস তাদের হয় না। কে না জানে, রতন কার রানার!

সংক্ষেপিত এই পথ ছাড়া আরও একটা পথ আছে অবশ্য। তবে ঝুঁকি কিছুটা বেশি। তা হলেও, গ্রামের লোকের ঘৃণার দৃষ্টিবাণ এড়াতে কোনওদিন রতন সে পথও ধরে। বিশেষ করে প্রথম পথের গ্রামে যদি কোনো বিয়েশাদি থাকে, তখন এই পথেই রতন ছোটায় তার গোরুর পাল।

আর নয়। হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জিপরা, সারা শরীরে গোরুর গন্ধ মাখা রতনের আজই শেষ ট্রিপ্— রানার জীবনেরও সমাপ্তি। বলে দিয়েছেন রায়সাহেব। রতনের মন তাই ফুরফুরে আনন্দে যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে। তার এমন অন্যমনস্কতার মধ্যেই কালবোশেখির ঝড়ে হঠাৎ ধুলোয় ঝরাপাতায় যেন অন্ধকার গ্রাস করল দশদিক। পরে পরেই নামল যেমন আকাশ ভাঙা তুমুল বৃষ্টি, তেমনি ঘন ঘন বজ্রপাতের বুক কাঁপানো শব্দ। পশুগুলো ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে বড়ো বড়ো আমগাছগুলোর তলায়। রতনও দাঁড়াল বাধ্য হয়ে। বৃষ্টির দাপটে আর ঠাণ্ডা দমকা বাতাসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন কাবু হয়ে পড়ছে রতন।

এমন দুর্যোগের মধ্যেও ভবিষ্যতের রামধনু কল্পনায় রতনের স্বপ্ন তরী ভেসে চলেছে। আর মনের আয়নায় বারবার ভেসে উঠছে নয়নের মুখ। সেই সঙ্গে ভাসছে রায়সাহেবের আশ্বাসভরা হাসি মুখ, হাতে ধরা তার একমুঠো নোট।

এতক্ষণ এভাবে মুষলধারা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে রতনের। তাহলে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে ভিজে কী হবে? সময়টাও যেন কঠিন প্রতিপক্ষ! এবার তাই গোরুগুলোকে তাড়া করে কোনোটার লেজ মুচড়ে, কোনোটার পেটে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে জোর করে পথে নামিয়ে ছোটাতে থাকল। সময় যে এগিয়ে চলেছে তার বাঁধনহারা গতিতে।

এতকিছুর পরেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অভিজ্ঞ রতন তার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট পয়েন্ট মুখে।

পশুগুলো হাত বদল হয়ে ঢুকে যেতে থাকল অন্য সীমানায়।

রতন তার লাস্ট ট্রিপের নির্বিঘ্ন সফলতায় আর মুক্তির আনন্দে ফেরার পথ ধরতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল একটু। এপথে সে আর আসবে না কোনোদিন। কেমন একটা অবুঝ মায়ায় নিমেষহারা হয়ে রতন চেয়ে থাকল ওপারের আকাশ সীমায়। ওখানে কাঁটাতার নেই।

না, আর দেরি নয়, রক্তিম হয়ে উঠছে পুবের আকাশ। পিছু ফিরেই দৌড় শুরু করল রতন। তখনই হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ শিষের মতো একটা শব্দ ছুটে এসে বিদ্ধ করল রতনকে। যে শব্দ রতনের খুব চেনা। ভাবার সময়টুকুও পেল না— কোন ব্যাধের শিকার হলো সে! ■

দলু কাকা

বারিদবরণ বিশ্বাস

আজ কদিন ধরে যেন বৃষ্টির বিরাম নেই। হয়েই চলেছে তো হয়েই চলছে। জামা কাপড় কাচতে না পেরে মেঝের উপর ডাই করে রাখা। তার উপর আমার সুগারের সমস্যা। রোজ কিছুটা করে হাঁটি। এ কদিনে সেটাও আর হবার নয়। আকাশের এমন মুখভার কদিন ভালো লাগে? তাছাড়া আমি না হয় সরকারি চাকুরে, দিন তিনেক সি এল নিতে পারব, কিন্তু দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো? শিমুলের মা বলছিল মাঠে থেকে সবজিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল। যেগুলো তুলেছিল সেগুলোও বিক্রি করতে পারেনি।

বউ বাড়িতে নেই। আমি এখন একা। দুদিন তবুও রেইনকোট পরে স্কুলে গেছি। তবে ওইটুকু। স্কুল আর বাড়ি। এ কদিন ডাল আর আলুসেদ্ধ, আলুভাজা করে বেশ চলছিল। কিন্তু এখন আর মুখে তুলতে পারছি না। কী যে করি।

আজ মহালয়ার ছুটি। ভেবেছিলাম দামোদরের জলে নেমে প্রতিবারের মতো এবারও পূর্বপুরুষের উদ্দেশে তিলতর্পণ করে বাজারে গিয়ে কিছু ভালোমন্দ কিনে এনে খেয়ে জমাটি ঘুম দেব। আঃ মরণ! পাজি বৃষ্টি সব মাটি করেই ছাড়ল। একভাবে হয়েই যাচ্ছে তো যাচ্ছে। তাও একটু ফিসফিসিয়ে হতে পারত। ওমা এ দেখি ঝমঝমিয়ে শুরু করেছে। সারা বর্ষাকাল জুড়ে কীভাবে হাইডাই করে মরেছি।

আয় বৃষ্টি আয়রে, কোথায় বৃষ্টি। অনাবৃষ্টিতে এবার সব শুকনো। ডোবা পুকুর হাফের হাফ। ব্যাঙগুলো পর্যন্ত তাদের গোঙা গোঙা গান গাওয়া ভুলে গেছে। আর এখন ইনি অসময়ে তার ঝমঝমানি বাদ্যি বাজাতে শুরু করেছেন। একি সহ্য হয়! সামনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। রাগে যেন গর গর করছিল মনটা।

হঠাৎ দেখি একটা লোক সাইকেলে চেপে হাঁক পাড়ছে— সবজি, সবজি চাই। আমি বেরিয়ে এলাম। কিন্তু যাবো কী করে? মুহূর্তে চিন্তা করে আমিও হাক দিলাম কী সবজি?

উত্তর এলো পটোল, বেগুন, কচুরলতি, কলমি শাক। প্লাস্টিকে মোড়া লোকটা এগিয়ে এলো ভ্যান নিয়ে আমার নেওয়া না নেওয়ার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে।

আমি একটি ভাঙ্গা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে দেখলাম ডালায় রাখা সবজি। সব প্রায় আধ পচা।

দলুকাকা আমাকে দেখেই বললো তুমি! এখানে কতদিন?

উত্তর দিলাম মাস দুয়েক হলো। তা তুমি কতদিন এ পেশায়?

‘এই তো বছর খানেক হলো। কী করবো বলো বাপ। কারখানা বন্ধ। শুয়ে বসে আর কতদিন? যা জমিয়েছিলাম, তা তোর কাকিমার অসুখের পিছনে গেল। তারপর কতদিন থেকে না পেরে এই।’ বললাম, কাকু ঘরে এসো। বৃষ্টিতে ভিজে তো তোমার বড়ো একটা অসুখ বেধে যাবে।

দলুকাকা শান্ত শুকনো মুখে বলল, ‘আর কী সুখে আছি বাপ। এ কদিন বসে থেকে না পেরে আজ বেরিয়ে পড়তেই হলো। তোর কাকিমা বলল, চাল বাড়ন্ত। আমরা দুটি না হয় উপোস করেই কাটালাম। কিন্তু ঘরে যে তোমার পোয়াতি মেয়েটা। ওর মুখে তো দুটি দিতে হবে।’ সহসা আমার সাথীর কথা মনে হলো। ও আট মাসের পোয়াতি। এখন ভালো মন্দ যেটা খেতে চায়, খাওয়াতে হয়। আমি যথাসাধ্য খাওয়াইও। কিন্তু দলুকাকার মেয়ে। আমি ওকে ছোট্ট থেকে চিনি। বড়োই লাজুক। কতদিন টিফিনে জল খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। খিদে পেলেও বলত খিদে পায়নি। তোরা খা। সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে বিকাল পাঁচটায় বাড়ি ফিরতাম।

বলতাম খিদে পায়নি বললে বিশ্বাস করবো। খেতে বলছি খা। অনেক জোরাজুরিতে নিত। আর যখন খেত, তখন লক্ষ্য করতাম অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা ওর চোখে মুখে।

আমার সংবিৎ ফিরল কাকার কথায় কী কী নেবে বললে না তো। তাড়াতাড়ি দিয়ে তোমাকে আরও দু'ঘর যাই। যদি দু' কেজি চালের, পয়সা উপায় করতে পারি। আমি টপাটপ কিছু পটোল, বেগুন, ট্যাঁড়শ নিয়ে ওজন করতে দিয়ে ঘরে এলাম। একশো টাকার নোট থাকা সত্ত্বেও পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বললাম নাও। দলুকাকা আতঙ্কের সঙ্গে বলল, তুমি আমাকে একী বিপদে ফেললে বাপ! পাঁচশো টাকার ভাঙটি এখন কোথায় পাবো? খুচরোই দাও না। এই বর্ষার মধ্যে এ তোমাকে দিয়ে প্রথম বউনি করছি।

আমি বললাম, ‘কাকা ভাঙটি করে তোমাকে দিতে হবে না। এই পুরো টাকাটাই তুমি রাখো।’

দলুকাকা বেশ রেগে গেল। বলল, ‘তুমি আমাকে দয়া করছ? এ তুমি রাখো। খুচরো থাকলে দাও। নইলে পরে দিও।’

আমি কাকার হাতে ধরে বললাম, কাকা, তুমি এটা রাখো। বাকি টাকার সবজি দিয়ে শোধ দিও। তুমি এটাকে দয়া ভাবছ কেন? তাছাড়া দুর্গা কী আমার কেউ নয়?

আমরা একসঙ্গে পড়েছি। ভাই-বোনের মতোই তো মানুষ হয়েছি। তুমি আমাকে পর ভেবো না। সুবিধা অসুবিধার কথা জানিও।

দলুকাকা এবার টাকাটা নিল। আমি বললাম, ‘আজ এই পথে আর না ভিজে বাড়ি চলে যাও।’ ‘তুমি আমাকে বাঁচালে বাপ। দুর্গার ওযুধও ফুরিয়েছে দুদিন’ বলে দলুকাকা মুখে আর বিশেষ কিছু বললো না। একবার শুধু দিকে তাকিয়ে ভগবানের উদ্দেশে হয়তো কিছু বলেছিল।

টাকাটা পুজোর চাঁদার জন্যই তোলা ছিল। হয়তো ওরা আসবে। একটু রাগারাগি করবে। কিন্তু তা সব সইতে পারব জ্যান্ত দুর্গার উপবাস দূর করার সান্ত্বনা নিয়ে।

With Best Compliments From :-

VIKRAM INDIA LIMITED

MANUFACTURER & EXPORTER OF LARGEST RANGE OF
TEA PROCESSING MACHINERY & TURN KEY PROJECTS.

Head Office
Tobacco House,
1, Old Court House Corner,
Kolkata - 700 001, India
Ph: +91 33 22307299
(F): + 91 33 22484881

Factory
Vill: Jala Dhulagori,
P.O. - Sankrail
P.S. - Sankrail
Howrah - 711302, India
Ph: 9830811833

Email : kolkata@vikram.in
Visit us at : www.vikramindia.in

With Best Compliments
From :-

Mukundan Raman

অন্য রকম

স্বামীজীর আদর্শে দীক্ষিত এক পরিব্রাজক

তরুণ কুমার পণ্ডিত

দিব্যাঙ্গদের মধ্যে এখনও এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা নিজেকে অসহায় মনে করেন না কিংবা অপরের গলগ্রহ হয়ে সমাজে বেঁচে থাকতে চান না। তাঁরা সমাজের আর পাঁচটা মানুষের মতোই মাথা উঁচু করে প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে জীবনে বড়ো কিছু একটা করে যেতে চান। এমনি একজন মানুষের দেখা মিললো মালদা জেলার সঙ্ঘ কার্যালয়ে। যিনি জন্মের পরপরই পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে দুই পায়ের শক্তি হারিয়ে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের তালিকায় নাম লিখিয়েছিলেন, অথচ মনের জোরে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সারা দেশ পরিভ্রমণে বেরিয়ে সম্প্রতি শিলিগুড়ি থেকে মালদা শহরে এসে পৌঁছেছেন, তাঁর একমাত্র সম্বল তিনচাকার স্কুটার নিয়ে। হ্যাঁ আমি এতক্ষণ যার বর্ণনা করে গেলাম তিনি ভারতের শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রে রেলওয়ে ইনফরমেশন সেন্টারে কর্মরত কে কে থঙ্গরাজ। গত ২৬ নভেম্বর জম্মু ও কাশ্মীর-সহ ২৪টি রাজ্য ভ্রমণ করে তিনি মালদা পৌঁছালেন। এর আগে বলিষ্ঠ যুবক থঙ্গরাজ কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্র থেকে নিজেকে পঙ্গু না ভেবে স্বামীজীর আদর্শকে সামনে রেখে এবছরের ১১ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'এক ভারত বিজয়ী ভারত' মন্ত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর এই যাত্রায় ৫০টির বেশি স্কুল ও কলেজে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কীভাবে সারা দেশ পরিভ্রমণে বেরনোর সাহস করলেন? উত্তরে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের কথা বললেন। যেখানে স্বামীজী বলছেন, ''তুমি যা চিন্তা করবে, তাই হয়ে যাবে। যদি তুমি নিজেকে দুর্বল ভাবো, তুমি দুর্বল হবে। তেজস্বী ভাবলে তেজস্বী হবে'। তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম, স্বামীজী আরও বলেছেন, মানুষকে সবসময় তার দুর্বলতার প্রতিকার নয়, তার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। নিরাশ হয়ো না; পথ বড়োই কঠিন, তাহলেও নিরাশ হয়ো না। ওঠো---জাগো এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও। জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়িতে কে কে আছেন, উত্তরে মৃদু হেসে থঙ্গরাজজী জানালেন, বাবা, মা, দুই ভাই, স্ত্রী ও এক কন্যা রয়েছে। এতটা পথ অতিক্রম করলেন, কোথাও কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি? জম্মু ও কাশ্মীরে কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল, কেননা তখন সেখানে ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে রাস্তাঘাট থমথমে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও ইন্টারনেট না থাকায় যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, তবে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলাম বলে তেমন বড়ো ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়িনি।

১৪৫০০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে ২৪টি রাজ্যের মধ্যে দিয়ে এসেছি, সবজায়গাতেই উষ্ণ সংবর্ধনা পেয়েছি, সবাই আমার এই যাত্রাকে পছন্দ করেছেন, ফুলের মালা দিয়ে আমার স্কুটার সাজিয়ে দিয়েছেন এবং স্বামীজীর শাশ্বত বাণী শুনেছেন। থঙ্গরাজজী জানালেন, বিবেকানন্দের স্মৃতি মন্দির বা রক মেমোরিয়াল প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যেই আমার এই ভারত ভ্রমণের আয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ বা জেনারেল সেক্রেটারি স্বর্গীয় একনাথ রানাডে ১৯৭০ সালে স্বামীজীর প্রতি তাঁর নিজস্ব শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে কন্যাকুমারীর অদূরে সমুদ্রগর্ভে শিলাখণ্ডের উপর স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অপূর্ব সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। ১৯৭২ সালে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি 'বিবেকানন্দ কেন্দ্র' নামে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। যেখানে স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে সামনে রেখে যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

যাইহোক, থঙ্গরাজজীকে সেদিন রাতে সঙ্ঘ কার্যালয়ে ওঠার জন্য ওই খাড়া সিঁড়ি দিয়ে অবলীলায় চলতে দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম। রাতে বিশ্রাম করে পরদিনই বাকি ছয়টি প্রদেশ অতিক্রম করে পুনরায় তিনি কন্যাকুমারীতে ফিরে যাবেন। আমি বাড়ি চলে এসেছিলাম। কিন্তু পরদিন তিনি ফোন করে জানাতে ভোলেননি কন্যাকুমারী গেলে তাঁকে যেন মনে রাখি। তাঁকে দেখে স্বামীজীর সেই কথা খুব মনে পড়ছে, যিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন, তিনিই সবচেয়ে সুখী, তাঁর কাজই সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনিই সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেন। ∎

নবাঙ্কুর

ফিঙ্গার প্রিন্টের জনক ভারতবর্ষ

আমরা কেউ কেউ হয়তো জানি যে, অঙুলাঙ্ক অর্থাৎ ফ্রিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবস্থার উদ্ভব, প্রয়োগ ও প্রচলন এই ভারতবর্ষেই ঘটেছিল। আজ থেকে একশো বছরের সামান্য কিছু আগে, কলকতার রাইটার্স বিল্ডিঙে স্যার ইআর হেনরি তাঁর দুই সহযোগী হেমচন্দ্র বসু ও আজিজুল হককে নিয়ে পৃথিবীর প্রথম কার্যালয়— ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরো চালু হয়। কঠোর পরিশ্রম ও অনলস অধ্যবসায়ের বিনিময়ে তাঁরা মানুষ শনাক্তকরণের এই বিশেষ পদ্ধতিটির প্রচলন করেন। এখানে সার্থক হবার পর বিষয়টি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারাই হেনরি সাহেবকে ভারত থেকে নিয়ে গিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট চালু করে। তারও অনেক পর আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে তা চালু হয়। অনেকেরই ধারণা এই পদ্ধতিটির উদ্ভাবক স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অথবা মার্কিনি এফবিআই।

আগে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ও ফোটোগ্রাফি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার অনেক ভুলভ্রান্তি চোখে পড়তে লাগল। শোনা যায়, ১৮৯১ সালে বঙ্গপ্রদেশের পুলিশবাহিনীর ইনসপেক্টর জেনারেল হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি। তিনি অপরাধী শনাক্তকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর অঙুলাঙ্ক পদ্ধতির অফিস গড়ে ওঠে রাইটার্স বিল্ডিঙের কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ে। নাম হয় 'ক্রিমিনাল আইডেন্টিফিকেশন ডিপার্টমেন্ট'। এই প্রচেষ্টায় দুই বাঙ্গালি ইনসপেক্টর হেমচন্দ্র বসু ও আজিজুল হক তাঁর সহায়ক ছিলেন। 'হেনরি পদ্ধতি' নামে ফিঙ্গার প্রিন্টে যে বিশেষ পদ্ধতিটি সারা বিশ্বে প্রচলিত সেই সূত্র আবিষ্কারে আজিজুল হকের অবদান বিশাল। মূল গাণিতিক সূত্র আবিষ্কারের পর সেটির বর্গকরণে হেমচন্দ্র বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

এর অনেক আগে অবশ্য হুগলীর কালেক্টর উইলিয়াম হার্শেল কাজের প্রয়োয়াজনে সরবরাহকারীদের অঙুলাঙ্ক ব্যবহার প্রচলন করেন যা আজকের ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবস্থার প্রসূতি। হার্শেল সাহেব তাঁর সংগৃহীত অঙুলাঙ্কের অ্যালবাম পরবর্তীকালে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস গ্যালটনকে দিয়ে যান। গ্যালটন ফিঙ্গার প্রিন্টের ওপর গবেষণালব্ধ বইটিতে উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, বঙ্গপ্রদেশের মানুষের অঙুলাঙ্ক চেতনা তার গবেষণায় সহায়তা করেছে।

আমাদের একটা ধারণা আছে যে, অপরাধী নির্ণয়ের জন্যই শুধু অঙুলাঙ্ক ব্যবহার হয়ে থাকে। তা সম্পূর্ণ ভুল ও একপেশে। এরফলে অনেক পরে এই পদ্ধতির প্রচলন ঘটিয়ে বিশ্বের বহু দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শনাক্তকরণে বহুল পরিমাণে সফল। সেক্ষেত্রে আমরা এই প্রচেষ্টার প্রথম প্রবর্তক হয়েও অনেক পিছিয়ে আছি। বর্তমান জটিলতর সমাজ জীবনে নাগরিক জীবনযাত্রার পরিচয় নির্ধারণে বহুক্ষত্রে সমস্যা হয়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিতে হাসপাতালে শিশু বদল, দুর্ঘটনায় মৃতের শনাক্তকরণ, আত্মীয়স্বজনের শনাক্তকরণ জনিত জটিলতার সহজ সমাধান সম্ভব।

পরিশেষে বলি, কেবলমাত্র বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব নয়, প্রচারের কার্পণ্যও দায়ী অঙুলাঙ্ক ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনে। বাংলাভাষায় ফিঙ্গার প্রিন্টের ওপর যতদূর জানি একটিমাত্র বই আছে, বিদ্যুৎ কুমার নাগের ' শতবর্ষের আলোয় ফিঙ্গার প্রিন্ট'। তাঁর ভাষায় 'তাই বাঙ্গলার সরকার তার কর্মচারীদের সার্ভিস বুকে আঙুলের ছাপ নিয়ে রাখলে যে কত সমস্যার সমাধান হতে পারে তা না জেনেই সেটাকে বাধ্যতামূলক করেনি। যেন আঙুলের ছাপ নেওয়া মানেই অপরাধী পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবেন তার কর্মচারীরা।' সাক্ষরতা কর্মসূচি আজ সর্বত্র প্রচার করছে, আঙুলের ছাপ দিয়ে চলাটা নাকি লজ্জার ব্যাপার। সাক্ষরতা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য ও কাম্য, কিন্তু শনাক্তকরণের জন্য আঙুলের ছাপের প্রয়োজন তার চাইতেও বেশি।

প্রবীর মুখোপাধ্যায়

ভারতের পথে পথে

কৌশানি

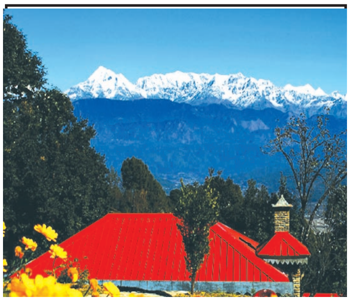

কুমায়ুন হিমালয়ের রূপবতী কৌশানি সারা পৃথিবীর পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ওক, চির পাইন ঘেরা সঙ্কীর্ণ শৈলশিরায় ১৮৯০ মিটার উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কৌশানি। কৌসিনমুনির নামানুসারে কৌশানি হয়েছে। শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে ১৮৬৪ সালে। গান্ধীজী কৌশানির প্রশান্ত রূপে মুগ্ধ হয়ে সুইজারল্যান্ডের-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কাছেই রয়েছে চার শৃঙ্গের চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, নন্দাঘুন্টি, তিন চূড়ার ত্রিশূল, মীরাঘুন্টি, দেবীদর্শন, ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ নন্দাদেবী, নন্দকোট, পঞ্চচুলী শিখররাজি হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত করে পর পর দাঁড়িয়ে রয়েছে। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ে রক্তিম আভার প্রতিফলনে দিগন্ত বিস্তৃত শিখররাজির মোহিনীরূপ অতুলনীয়। হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সারাদিনে ক্ষণে ক্ষণে রঙের বদল ঘটে, যা পর্যটকদের পাগলপারা করে তোলে। রয়েছে সোমেশ্বর মন্দির, ডান পাশে কালীমন্দির।

জানো কি?

আদর্শ বালক-বালিকার গুণ

- সূর্যোদয়ের পূর্বেই বিছানা ত্যাগ করা।
- বাবা-মা'র চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা।
- নিত্য ভালোভাবে দাঁত মাজা।
- নিত্য স্নান করা।
- সুস্বাস্থ্যের জন্য নিত্য ব্যায়াম করা।
- পরিষ্কার পোশাক পরা।
- গুরুজনদের সম্মান করা।
- পিতা-মাতার আজ্ঞা পালন করা।
- সদা সত্য কথা বলা।
- ভালো বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করা।
- মহাপুরুষদের জীবনী পড়া।
- ভালো কাজে আগে থাকা।

ভালো কথা

প্লাস্টিকমুক্ত ভারতের প্রতিজ্ঞা

আমরা সবাই জনি সারা পৃথিবীর অর্ধেক গ্রাস করে ফেলেছে প্লাস্টিক। নর্দমা, খাল-বিল, নদী, সমুদ্র সবকিছুতেই প্লাস্টিকের আবর্জনা এসে জমা হচ্ছে। ভারতবর্ষের পবিত্র নদী গঙ্গাও দিন দিন প্লাস্টিকে পূর্ণ হয়ে চলেছে। ২০১৪ সালে ভারত সরকার নমামি গঙ্গে প্রকল্প করে গঙ্গাকে স্বচ্ছ রাখার পরিকল্পনা করেছে। একাজে বহু শিক্ষিত মানুষ হাত লাগিয়েছেন। কিন্তু অশিক্ষিত, পেশায় জেলে বহরমপুরের কালীপদ দাস মাছ ধরা ছেড়ে দিয়ে গঙ্গা থেকে প্লাস্টিক তোলার কাজ শুরু করেছেন তিনবছর আগে থেকে। ৪৮ বছরের কালীপদবাবু নিজের নৌকা নিয়ে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে মানুষের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক ও জলের বোতল জল থেকে তুলে জমা করেন। তিনি ৫/৬ ঘণ্টার মধ্যে দু'কুইন্ট্যালের মতো প্লাস্টিকের বোতল জমা করন। সেগুলি বিক্রি করে দিনে ২ থেকে তিন হাজার টাকা রোজগার করেন। তিনি সবাইকে প্লাস্টিক ব্যবহার করতে নিষেধ করেন আর বলেন প্লাস্টিকমুক্ত ভারতের প্রতিজ্ঞা করুন সবাই।

বৈশালী চক্রবর্তী, দ্বাদশ শ্রেণী,গোরাবাজার বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ত্র মি লি প

(২) টি থ না প

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) নি হা গি প সো তি

(২) ব মু ন স ক্তা প ন

২ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) নকুলদানা (২) নখরঞ্জনী

২ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) নিত্যপ্রয়োজনীয় (২) নিরাপত্তাবাহিনী

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ। (২) সুজয় সাহা, কলেজপাড়া, কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিঃ। (৩) সুমন অধিকারী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া। (৪) শ্যামশ্রী কর্মকার, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১৬।।

শ্রীরামজন্মভূমির পুনরুদ্ধার হিন্দু অস্মিতার জয়

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষিত হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ন্যায়বিচার পেল অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ভারতের আস্থা, বিশ্বাস ও সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার প্রতীক। সারা বিশ্বের হিন্দুদের প্রাণকেন্দ্র। তাই ভারতীয়রা আজ প্রসন্ন। কারণ কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা সংঘর্ষ, সংগ্রাম ও অগণিত প্রাণের বলি ও আত্মোৎসর্গের পর আজ অযোধ্যা মামলা রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রামজন্মভুমি মুক্ত হলো ও সাধারণ মানুষের আস্থার জয় হলো।

ভারতের পুরা-ইতিহাসের এক বড়ো অংশ জুড়ে আছে অযোধ্যানগরী ও রামজন্মভূমি। কারণ শ্রীরামের জন্মভূমি অযোধ্যা। রামচন্দ্রের পিতা সূর্যবংশীয় (ইক্ষ্বাকু/রঘুবংশীয়) রাজা দশরথ রাজত্ব করেন মনুর সৃষ্ট অযোধ্যায়। রামচন্দ্রের জন্ম হয় এই অযোধ্যায় ত্রেতাযুগে, বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রূপে। অথর্ব বেদে অযোধ্যার উল্লেখ আছে। ঋকবেদে সরযূ নদীর বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে একাধিকবার অযোধ্যা ও রঘুবংশীয় রাজাদের কথা বলা হয়েছে। কালিদাসের রঘুবংশে অযোধ্যা ও রামরাজ্যের কথা বলা হয়েছে। গুপ্তযুগে (২০০-৪০০ খ্রি:) রাজা বিক্রমাদিত্য অতীত পুনরুদ্ধারে প্রয়াস করেন। ব্যাপক উন্নতি সাধন করা হয়। সরযূ নদীর সংলগ্ন এলাকা এবং জন্মস্থানের প্রভূত সংস্কার করা হয়। তবে সবই বিনষ্ট ও লীন হয় কালের কবলে। অযোধ্যার রামমন্দির বিশ্ববন্দিত। এশিয়ার বিভিন্নদেশে (ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ফিলিপিন্স) রাম ও রামজন্মভূমি আজও মহান এবং রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। এই রামমন্দিরের উপর আঘাত হানা হয় ১৫২৮ সালে বাবরের নির্দেশে এবং সেনাপতি মির বাঁকির নেতৃত্বে। মন্দিরটি ব্যাপক ভাবে ধ্বংস করা হয় কামানের সাহায্যে। ভাঙা মন্দিরের উপর নির্মাণ করা হয় মসজিদ। নাম দেওয়া হয় বাবরি মসজিদ। আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে। শুরু থেকেই হিন্দু সমাজের সাধু-সন্তরা রামমন্দির ধ্বংস করে মসজিদের নির্মাণ মেনে নিতে পারেনি। একাধিকবার সচেষ্ট হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হলো অযোধ্যার সংলগ্ন হিন্দু রাজারা (১৫২৮ খ্রি:) সংঘর্ষ করেন রামজন্মভূমিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য। পরবর্তীকালে (১৯৩৪) হিন্দুরাজারা, সাধু-সন্ত ও হিন্দুসমাজ মন্দির পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়। এর ফলস্বরূপ মসজিদের বড়ো অংশের ক্ষতি হয়। পরে ইংরেজ প্রশাসন হিন্দুদের থেকে অর্থসংগ্রহ (৮৪,০০০ টাকা) করে মেরামতির কাজ করে। এর ফলস্বরূপ মসজিদটির নিত্যনৈমিত্তিক নমাজ বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীরামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ নিয়ে যে বিতর্ক ও সমস্যা, একে কেবলমাত্র সম্পত্তির বিবাদ বলে দেখলে সেটা অনুচিত হবে। বাস্তবে, এই লড়াইটি ন্যায় ও সত্যের সংগ্রাম। রামজন্মভূমি ঘিরে হিন্দুধর্মের মূল্যবোধ, সহনশীলতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা জড়িয়ে আছে। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিরা তাঁদের তীর্থক্ষেত্র মক্কা-মদিনা, ভ্যাটিক্যান ও জেরুজালেমকে রক্ষা করেছেন ও করেন। সেইরূপ হিন্দুদের কাছে অযোধ্যা-রামলালা-মন্দির। শ্রীরামচন্দ্র হিন্দু দর্শনের (এমনকী রাজনৈতিক দর্শনেরও) প্রাণপুরুষ। তাঁরই পথ অনুসরণ করে হিন্দুর দর্শন-ধর্ম ও জীবনশৈলী একই সূত্রে গাঁথা।

শহিদ কলকাতার দুই ভাই শরদ ও রাম কোঠারী।

সুতরাং অযোধ্যার শ্রীরামজন্ম মন্দির রক্ষার জন্য হিন্দুরা যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত।

আন্দোলনের ইতিহাস শুরু দিকে

দেশ স্বাধীন হলো (১৯৪৭)। অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমিতে রামলালা বিরাজমান হলেন (১২-২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৯)। তৎকালীন প্রশাসন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল। হিন্দু-সমাজ আদালতে যায়। রামচবুতরা ও সীতারসুইয়ে পূজা ও আরতির আর্জি নিয়ে। যা এতদিন চলে আসছিল। আদালত তাদের প্রার্থনা অনুমোদন করেন। রামলালার নিত্যপূজা শুরু হয়।

এর পরের বছর (১৯৫০) গোপাল সিংহ বিশারদ আদালতে যান আর্জি নিয়ে সে রামলালার দর্শন, পূজা ও আরতি করতে আসা কোনও ব্যক্তিত্ব বা প্রশাসন যেন বাধা না দেয়। এর ফলে ব্যবস্থাপনার জন্য একজন প্রশাসননিক কর্তা নিযুক্ত হন। নির্মোহী আখড়া (১৯৫৯) আদালতে দাবি তোলে যে তাঁদের রামজন্মভূমির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হোক সরকারি ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে। এরপর (১৯৬১, ১৮ ডিসেম্বর) উত্তরপ্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড আদালতে যান তিন গম্বুজযুক্ত ধাঁচাটিকে সর্বজনীন মসজিদ বলে ঘোষণা করার দাবি নিয়ে। এইরকম একটি মাহেন্দ্রক্ষণে (১৯৬৪) শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে সান্দীপনী আশ্রম ও সাধনালয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা ও হিন্দুশক্তি জাগরণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরপুর শহরে (১৯৮৩) প্রথমে হিন্দু সম্মেলন আয়োজিত হয়। হিন্দু নেতারা (বিশেষ করে দাউ দয়াল খান্না) জনতাকে আহ্বান জানান অযোধ্যা, মথুরা ও কাশীর মন্দিরগুলিকে পুনরুদ্ধারের জন্য। এর পরই সন্তদের প্রথম ধর্মসংসদ সম্মেলন (১৯৮৪, ৭-৮ এপ্রিল) হয় দিল্লিতে। সেই সভায় সর্বপ্রথম শ্রীরাম জন্মভূমিকে মুক্ত করার ডাক দেওয়া হয়।

এরপর শুরু হয় জন-জাগরণের কর্মসূচি। সর্বপ্রথমে মূখ্য কর্মসূচি রাখা হয় শ্রীরাম জন্মভূমিতে লাগানো তালা খুলতে হবে এবং হিন্দু-সমাজকে অবাধে পূজা ও আরতির সুযোগ দিতে হবে। সীতামাঢ়ীতে রাম-জানকী রথের পূজন হয়। এই রাম-জানকী রথ আনা হয় (১৯৮৪,৭ অক্টোবর) অযোধ্যার সরযূ নদীতটে। রথকে সামনে রেখে হাজার হাজার রামভক্ত হাতে সরযূ নদীর পুণ্য বারি নিয়ে শপথ নেন, 'শ্রীরাম-জন্মভূমিকে মুক্ত করবেন, প্রয়োজনে প্রাণ দেবেন কিন্তু রামলালাকে দুর্দশা (বন্দি আছেন) থেকে মুক্ত করবেন।

শুরু হয় অযোধ্যার রামমন্দিরের আন্দোলন। রথযাত্রা দিয়ে রথ-আন্দোলনের পুরোধারা হলেন লালকৃষ্ণ আদবানি, অশোক সিঙ্ঘল (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) ও অযোধ্যার হিন্দু তপস্বী পরমহংস রামচন্দ্র দাস। পরমহংস রামচন্দ্র দাস হলেন সেই ব্যক্তি যিনি অযোধ্যার বাবরি ধাঁচার কেন্দ্রীয় গম্বুজের ভিতরে রামলালার প্রতিমা স্থাপন করেন। আর অশোক সিঙ্ঘলজী হলেন সেই কার্যকর্তা (ভিএইচপি) যিনি রামমন্দিরের আন্দোলনের বিষয় প্রথম ধর্মসংসদের (১৯৮৪) আয়োজন করেন এবং সাধু-সন্ত-রামভক্ত-দর্শনার্থীদের একত্রিত করে রামমন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। আর লালকৃষ্ণ আদবানী ছিলেন রাম-জানকীরথের সারথির ভূমিকায়।

রথযাত্রা

রাম-জানকী রথ লক্ষ্ণৌ পৌঁছোয় (১৪ অক্টোবর)। রথযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে জনজাগরণ শুরু হয়। হিন্দু-সমাজ ক্রমশই রথের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। সমাজে আসতে থাকে পরিবর্তন, যা বিরাট হিন্দু-জাগরণ রূপে প্রকাশ পায়। দুর্ভাগ্যবশত এই সময় (১৯৮৪, ৩০ অক্টোবর) তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হঠাৎ খুন হন। সারাদেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। রাম-জানকী রথের যাত্রা এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

পুনরায় রথযাত্র শুরু হয় (১৯৮৫, অক্টোবর)। এবার বড়ো আকারে। ৬টি রথের দ্বারা জনজাগরণ শুরু হয়। জনজাগরণ শুরু হয় রামমন্দিরের তালা খোলার জন্য। দেশময় রামলালার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখে, ফৈজাবাদের জেলা জজ্ (Faizbad District Judge) রামমন্দিরের তালা খোলার নির্দেশ দেন (১৯৮৬, ১ ফেব্রুয়ারি)। একটি কাঠের ভব্য রামমন্দিরের নকশা বানানো হয়। চন্দ্রকান্ত সোমপুরা এই নকশাটি তৈরি করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতৃত্ব (শীর্ষে ছিলেন অশোক সিঙ্ঘল) প্রয়াগ কুম্ভমেলায় (১৯৮৯, জানুয়ারি) ত্রিবেণীসঙ্গমের সংযোগ মূলে দ্বিতীয় ধর্মসংসদ আয়োজন করা হয়। এই মহান ধর্মীয় সম্মেলনে দেওরাহ বাবার (Deoraha Baba) উপস্থিতিতে রামলালাপূজন অনুষ্ঠানের শিলান্যাস হয়। পূজন অনুষ্ঠান দেশের প্রত্যেকটি মন্দিরে করার কথা বলা হয়। প্রথম শিলাটি পূজন করা হয় বদ্রীনাথ মন্দিরে। সেই বছরেই প্রায় তিন লক্ষের মতো পূজনশিলা অযোধ্যায় নিয়ে আসা হয়। মন্দিরের শিলান্যাস শুরু হয় (১৯৮৯, ৯ নভেম্বর) এবং বিহারের অবহেলিত সমাজের কামেশ্বর চৌপালকে দিয়ে। এই ভিত্তিপ্রস্তর সূচি তৎকালীন সরকারের দ্বারা অনুমদিত হয়।

সাধু-সন্তদের আগ্রহ অনুযায়ী করসেবা (১৯৯০, ২৪ জুন) শুরু করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয় এবং সেই মতো ঠিক হয় (১৯৯০, ৩০ অক্টোবর)। অযোধ্যায় পূতজ্যোতি জ্বালান হয়। 'আরুণি মন্থন' (কাঠের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা) সাহায্যে। এই পূতময় অগ্নি সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে পাঠানো হয়। ক্ষতির আশঙ্কায় আদালতের দ্বারস্থ হয় বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি।

করসেবা (পর্ব-১)

নানান ঘটনার ঘনঘটায় রামভক্তরা অযোধ্যায় জড়ো হতে থাকে। কারণ এইবার করসেবা শুরু হবে। যার তারিখ অনেক আগেই ঠিক ছিল (৩০ অক্টোবর)। এই করসেবায় নেতৃত্বে দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সঙ্ঘ। ভারত জুড়ে শ্রীরাম রথযাত্রার ঐতিহাসিক মিছিলের গতিরোধ হয় বিহারে লালুপ্রসাদের নেতৃত্বে। বলা হয় বিহার রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণেই রথযাত্রার গতিরোধ। উত্তরপ্রদেশে মুলায়মজীর নির্দেশে করসেবকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের আদেশে অযোধ্যায় প্রবেশের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ ছিল। পরিবহণের সমস্ত যানবাহন রেলগাড়ি, বাস (সরকারি ও বেসরকারি) এবং মোটরগাড়ি বন্ধ যাতে কসসেবকরা কোনোভাবেই প্রবেশ না করতে পারেন। সারা শহর ও শহরতলিকে নাকাবন্ধি করে দেওয়া হয় যাতে করে 'মাছিও না গলতে পারে'।

সরকারের এই কঠোর আচরণ কিন্তু হিন্দুদের মনোবলকে দমন করতে পারেনি, বরং হাজার হাজার করসেবক তৈরি হন অযোধ্যার রামজন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে। করসেবকরা যাত্রা শুরু করেন, পুলিশ গুলি চালায় (২ নভেম্বর, ১৯৯০)। করসেবকরা শহিদ হন (সরকারি হিসাবে ১০, বেসরকারি ভাবে অনেক বেশি) যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলকাতা নিবাসী দুই কোঠারী সহোদর ভাই (শ্রীরাম কোঠারী ও শ্রীশরদ কোঠারী)। দিনের শেষে সরকার বাধ্য হন করসেবকদের অনুমতি দিতে রামলালাকে দর্শনের জন্য। কারণ করসেবকরা বদ্ধপরিকর ছিলেন, রামলালার দর্শন না করে ফিরবেন না। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, নিরপরাধ ও শান্তিপূর্ণ করসেবকদের উপর গুলি চালালে সত্যাগ্রহ শুরু হয় এবং রোজ সহস্রাধিক মানুষ এতে যোগদান করেন।

দিল্লির বোটক্লাবে ৪ এপ্রিল ১৯৯১-এ এক বিশাল ভারত হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিশাল জনসমাবেশ (২৫ লক্ষ) হয়। এই জনসভা শেষ হবার আগেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী (মুলায়ম সিংহ যাদব) পদত্যাগ করেন। প্রদেশে আবার নির্বাচন হয়। কল্যাণ সিংহ সরকার ক্ষমতায় আসেন। উত্তরপ্রদেশের সরকার ৪২ একর জমির অধিগ্রহণ করেন (বিতর্কিত ধাঁচার ২.৬ একর ছাড়া) এবং 'শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাস'কে প্রদান করেন।

করসেবা (পর্ব-২)

'রামপাদুকা পূজন' শুরু করা হয় (সেপ্টম্বর ১৯৯২) সারা দেশ জুড়ে এবং পুনরায় রামভক্তদের আহ্বান করা হয় অযোধ্যা করসেবার জন্য। দিল্লিতে পঞ্চম ধর্মসংসদের আয়োজন করা হয় (২৯-৩০ অক্টোবর, ১৯৯২)। ঘোষণা করা হয় সরকারের অধিকৃত জমিতে বিতর্কিত ধাঁচার (২.৬ একর) পুনরায় করসেবা শুরু করা হবে। দিনটি ঠিক হয় গীতা জয়ন্তী (৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২)।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বিচার পীঠের

রামজন্মভূমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মামলার রায় ঘোষণা করার তারিখ ছিল ৩ ডিসেম্বর। যা পিছিয়ে দেওয়া হয় ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ফলস্বরূপ তখন অযোধ্যায় উপস্থিত (প্রায় ১ লক্ষ) করসেবকদের মধ্যে ভীষণ অস্থিরতা তৈরি হয়। ৫ ডিসেম্বর অযোধ্যায় প্রায় ৫ লক্ষ করসেবক উপস্থিত হন। শান্তি-শৃঙ্খলা বলবৎ করতে কেন্দ্রের আধা সামরিক বাহিনী (২৫ হাজার) নামানো হয়। কল্যাণ সিংহ ঘোষণা করেন করসেবকদের উপর গুলি চালানো হবে না। করসেবকদের মধ্যে আক্রোশ ছিল লক্ষ্ণৌ বিচারপীঠের রায়ের তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্য।

ছবি: পুলিশের ঘেরাটোপে অশোক সিংঘল।

অশোক সিঙ্ঘল, লালকৃষ্ণ আদবানি, রামচন্দ্র দাস, উমা ভারতী, বিনয় কটিয়া, গিরিরাজ কিশোর ও বিভিন্ন সাধু-সন্তরা 'শ্রীরাম করসেবা সমিতি'র বৈঠক করেন। সংকল্প নেওয়া হয় প্রতীকি করসেবা হবে এবং আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করা হবে। বলা হয় ৬ ডিসেম্বর বেলা ১২-১৫ মিনিটে করসেবা শুরু হবে। সমস্ত করসেবককে শান্ত ও অনুশাসনের মধ্যে থাকতে বলা হয়। বিচারালয়ের দীর্ঘসূত্রিতা ও সরকারের টাল বাহানার জন্য শান্তিপ্রিয় করসেবকদের মন ভারক্রান্ত ও নিদারুণ চাপের মধ্যে ছিল। এই মনোকষ্ট নিয়ে করসেবকেরা পবিত্র সুরময় তট থেকে যাত্রা শুরু করে শিলান্যাসস্থলে আসেন। ঘড়িতে কাঁটা তখন দুপুর ১২টা, বিশাল সংখ্যক (১ লক্ষ) করসেবক শ্রীরামজন্মভূমির শিলান্যাসস্থানে জড়ো হন। দূরে সভা হচ্ছিল। আদবানীজী ও অন্য নেতারা মাইকে বার বার ঘোষণা করেছিলেন করসেবা প্রতীকী হবে এবং অনুশাসনে থাকতে হবে। একথায় সভায় থাকা করসেবকরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কিছু সংখ্যক করসেবক বাবরি ধাঁচার দিকে চলে যায় এবং হাতের কাছে যা পায় তা দিয়ে ধাঁচাতে প্রহার করতে থাকে। প্রশাসন প্রথমে বাধা দিলে পরে তারাও হাল ছেড়ে দেয়। দেখতে দেখতে সহস্র সহস্র করসেবক ধাঁচার গম্বুজেতে উঠে পড়েন। চারিদিকে তখন একটাই ধ্বনি 'একই নারা, একই নাম— জয় শ্রীরাম— জয় শ্রীরাম'। পুরনো চুন-সুরকি তৈরি ধাঁচাটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ধাঁচার ধ্বংসস্তূপ সরানো হয়। অস্থায়ী মণ্ডপ (বাঁশ-বল্লা-ত্রিপল) তৈরি করা হয়। রামলালাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঘটা করে পূজা অর্চনা আরম্ভ করা হয়। আজও রামলালা তাঁবুতে বিরাজমান। পরের দিন কেন্দ্রীয় সরকার কার্ফু জারি করেন। করসেবকরা স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হন।

বিতর্কিত ধাঁচাটি ধূলিসাতের ফলে হিন্দু-বিরোধী শক্তি সহিংস হয়ে ওঠে। সারাদেশে জাতিদাঙ্গা বেঁধে যায়। প্রায় ২০০০ লোকের জীবন নাশ হয়। দেশের ১৩৫টি শহর-শহরতলিতে কার্ফু লাগানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার রামজন্মভূমি অধিগ্রহণ (৬৫.৫ একর অ্যাক্ট-৩৩/ ১৯৯৩) করেন। কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দু-বিরোধী শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও তার সংযোজক আয়াম বজরং দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে (১০ ডিসেম্বর, ১৯৯২)। এর চারদিন পর (১৫ ডিসেম্বর) রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ভারতীয় জনতা পার্টির (ভাজপা) সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। সেই থেকে অয়োধ্যায় 'রামজন্মভূমি'তে দর্শনের উপর বাধা ও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

আদালতে 'রমজন্মভূমি'

'রামজন্মভূমি বিতর্কিত মসজিদ ধাঁচার' বিলোপনের ঠিক একমাস পরে (৭ই জানুয়ারি, ১৯৯৩) তৎকলীন ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টে একটি প্রশ্ন করে তার উত্তর চেয়ে পাঠান। যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল— 'অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ তৈরি হবার পূর্বে কি কোনো হিন্দু মন্দির বা ধর্মস্থান ছিল? এই মন্দির ভেঙে কি ধাঁচাটি তৈরি করা হয়েছে?' এই সময়ই (১৯৯৩) অযেধ্যার রামজন্মভূমির জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজ সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় (ভারত সরকার বনাম ইসমাইল ফারুকি মামলা)। মামলার রায়ে (অক্টোবর ১৯৯৪) সুপ্রিমকোর্ট রাষ্ট্রপতিকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে অপরাগ হয়। সেই সঙ্গে আদালত বিতর্কিত ধাঁচার ও ভূমির অধিগ্রহণ রদ করে। কোর্ট ভারত সরকারকে বিতর্কিত ধাঁচা ও ভূমির স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এবং সমস্ত স্থানটিকে নিরাপত্তা প্রদান করতে বলেন। যদিও কোর্ট অবশিষ্ট জমির (৬৭ একর) অধিগ্রহণ সঠিক বলেছিল।

উত্তরপ্রদেশের হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বিচারপীঠ রামজন্মভূমি সংক্রান্ত

সকল মামলাগুলিকে এক সঙ্গে শোনার জন্য তিন ন্যায়াধীশকে নিয়ে একপূর্ণ বিচারপীঠ তৈরি করেন (১৯৯৫) বিতর্কিত ধাঁচার বিতর্কের মূল রহস্যকে (বিতর্কিত মূলের মাটি নীচের প্রাচীনসত্য অর্থাৎ হিন্দু মন্দির বা উপসনাস্থল ছিল কিনা) জানার জন্য লক্ষ্ণৌ ন্যায়াধীশের বিচার পীঠগণ রাডার তরঙ্গের দ্বারা মাটির তলায় অবস্থিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষের ছবি তোলার জন্য আদেশ দেন (১ আগস্ট, ২০০২, Ground Prentrating Radar Servey, GPRS)। জমির তলার নিরীক্ষণের কাজটি করেন বিদেশের একটি সংস্থা (কানাডা)। এই বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্য পাওয়া যায় তা প্রচলিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। মাটির তলার ছবি থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে বিতর্কিত ধাঁচার নীচে (০.৫-৫.৫ মিটার) অনিয়মের (anomalies) চিহ্ন আছে। এই চিহ্নগুলি হলো স্তম্ভ, দেওয়াল, ঢালাই করা পাথর বসানো মেঝে ইত্যাদি। এই চিহ্নগুলি সবই সুপ্রাচীন। রাডার ফোটোগ্রাফিতে প্রাপ্ত সত্যকে পুনঃ যাচাই করার জন্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে ওই স্থানে খননের আদেশ দেন কোর্ট। এই খনন কার্যের নির্দেশ ছিল আগের রাডার বিবৃতিতে এবং শুরু হয় এই বছরেই (২৩ অক্টোবর ২০০২)। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাদের খনন কার্যে বিবরণ আদালতে জমা করেন (২২ আগস্ট, ২০০৩)। যে তথ্য সামনে আসে তার থেকে সত্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাডার তরঙ্গের আলেকচিত্র ভিত্তি এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের তথ্যে এটা পরিষ্কার হয় যে মাটির নীচে এক বিশাল সুপ্রাচীন ভবনের অবশেষ রয়েছে। এই খনন কার্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে একাধিক ভাস্কর্য (পদ্মফুল, দেব-দেবীর মূর্তি, খোদাই করা ইট) পাওয়া যায় যা দেখে সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে বিতর্কিত ধাঁচার নীচে উত্তর ভারতীয় শিল্পরীতির একটি হিন্দু মন্দির ছিল। রামজন্মভূমির উপর সন্ত্রাসবাদীদেরও হামলা হয় (৫ জুলাই, ২০০৫)। রামলালার কৃপায় কোনো অঘটন ঘটেনি এবং বিস্ফোরণও হয়নি।

‘রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ সমিতি’ সারা দেশ জুড়ে (২০০৬) হিন্দু সম্মেলন করেন। প্রয়াগের অর্ধকুম্ভতে (১৩ জানুয়ারি, ২০০৮) দ্বাদশ ধর্ম-সংসদের আয়োজন করা এবং সর্বসম্মতিক্রমে যেখানে রামলাল বিরাজমান সেখানেই ভব্য মন্দির করার সংকল্প নেওয়া হয়। হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ (৬ এপ্রিল, ২০১০)-তে আয়োজিত সাধু-সন্তদের মহাসম্মেলনে শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ নিয়ে পুনরায় সংকল্প নেওয়া হয় এবং সারা ভারতে হনুমানশক্তি ‘জাগরণ’ কার্যক্রম করার কথা বলা হয় মন্দির নির্মাণ দ্রুতগতি এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বিচারপীঠ, রাডার ফোটোগ্রাফির প্রাপ্ত তথ্য এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেন (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০)। বিচারপতিরা বলেন পুরাতন হিন্দু ধর্মস্থান ও ভবনকে ভেঙে বিতর্কিত ধাঁচা তৈরি করা হয়েছিল। বিতর্কিত ধাঁচাটি বাবরের নির্দেশে তৈরি হয়েছিল। তিনটি গম্বুজযুক্ত ধাঁচা কোনো পতিত জমিতে তৈরি করা হয়নি। এটি অবৈধভাবে হিন্দু মন্দিরের (অ-ইসলামীয় ধর্মীয় ভবন) উপর তৈরি করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে নির্মোহী আখড়া (১৯৫৯ সালে দায়ের করা মামলা) ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড (১৯৬১ সালে দায়ের করা মামলা) মামলাগুলি খারিজ করে দেন। পরিশেষে, বিচারপতির (এম ইউ খান ও সুধীর অগ্রবাল) বিতর্কিত ভূমিটিকে তিন অংশে বিভাজিত করে সমান অংশে রামলালা (আইনগত ভাবে তাঁর ব্যক্তি অস্তিত্ব আছে), নির্মোহী আখড়া এবং সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে ভাগ করে দেন। যদিও এই মামলাটি

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

BOSCH LTD. BOSCH, GMBH-GERMANY,

DEUTZ, A. G., GERMANY

LOMBARDINI - ITALY, V. M. MOTORI - ITALY

রামমন্দিরে ব্যবহারের জন্য পাথর পরিদর্শন করছেন সাধু-সন্তরা।

জমি বাঁটোয়ারা বিষয়ক ছিল না।

সুপ্রিম কোর্টে 'রামজন্মভূমি'

হাই কোর্টের জমি ভাগের রায় ন্যায়সঙ্গত ছিল না। সুপ্রিম কোর্টে সনির্বন্ধ আবেদন করা হলে (ডিসেম্বর ২০১০) আবেদনের শুনানি দীর্ঘদিন ঝুলে রইল (জুলাই ২০১৭)। মামলাটি কোর্টে উঠল (সেপ্টেম্বর, ২০১৭)। সমস্যা দেখা দিল বহু ভাষা ভিত্তিক (হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, ফারসি ও পারসিক) দলিল দস্তাবেজ। যার ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন। কারণ সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম হয় ইংরেজি ভাষায়। উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার ৪ মাসে দস্তাবেজ (১৪০০০ পৃষ্ঠা) অনুবাদ করে দেন।

সর্বোচ্চ আদালতে শুনানি শুরু হয় (২৯ অক্টোবর, ২০১৮)। বিচারালয় মামলটি গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে শুনানি স্থগিত রাখেন (জানুয়ারি ২০১৯)। বলা হয় পাঁচ সদস্যের বিচারপীঠ ওই মামলাটি শুনবেন। বার্তালাপের মাধ্যমে সমাধানসূত্র বের করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিন সদস্যর সমিতি গঠন করা হয়। ৬ মাস সময় দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটি অসফল হয় (১ আগস্ট, ২০১৯)। আদালত ৬ আগস্ট থেকে আবেদনের নিয়মিত শুনানির (সপ্তাহে পাঁচদিন, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত ১ ঘণ্টা, দরকার হলে শনিবারেও শুনানির আদেশ দেন। ৪০ দিন ধরে (৬ আগস্ট থেকে ১৬ অক্টোবর) আইনজীবীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। এই পর্ব চলাকালীন (সেপ্টেম্বর মাসে) উভয়পক্ষের বার্তালাপের কথা ওঠে কিন্তু রামলালার পক্ষ এর বিরোধিতা করেন এবং পত্র দিয়ে জানিয়ে দেন। শুনানি শেষ হয় (১৬ অক্টোবর)। ন্যায়ালয় ঘোষণা করে যে চূড়ান্ত নির্ণয় সুরক্ষিত।

সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করেন (১০৪৫ পৃষ্ঠা, ৯ নভেম্বর ২০১৯)। বলা হয় শ্রীরামচন্দ্র বিতর্কিত স্থানেই জন্মেছেন। এ নিয়ে যুক্তি নয়, বিশ্বাস, আস্থা ও উপলব্ধিই মুখ্য। হিন্দুরা স্মরণাতীতকাল থেকে রামচবুতরা, সীতারসুইয়ে পূজার্চনা করে এসেছেন। বিতর্কিত ধাঁচার নীচে প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ পাওয়া গেছে যা বিজ্ঞানভিত্তিক। যেটি উত্তর ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও পূজামূলের পরিচয় বহন করে। সুতরাং সমগ্র রামজন্মভূমি (৬৭ একর) হিন্দুদের দেওয়া হলো (ভারত সরকারকে রামমন্দির নির্মাণের জন্য একটি ন্যাস তেরি করতে বলা হয় (তিন মাসের মধ্যে) যাতে নির্মোহী আখড়াকে নিতে বলা হয়। অযোধ্যার মধ্যে ৫ একর জমি দিতে বলা হয় সেখানে মসজিদ নির্মাণ হবে।

উপসংহার

রামজন্মভূমির নিষ্পত্তি ভারতবর্ষের জন্য এক নতুন অধ্যায়। আজকের ভারতবর্ষে যখন জাতীয়তাবাদী বনাম বাম-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির লড়াই চলছে তখন আরও একবার জাতীয়তাবদীদের জয় হলো। করণ রাষ্ট্র কেবল ভূখণ্ড নয়। বরং ওই ভূমিতে জন্মগ্রহণকারী এক জনগোষ্ঠীর একাত্মতার ভাবনা। এই একাত্মতাই ইতিহাস, পরম্পরা ও সংস্কৃতির নির্মাতা। তাই ভারতীয়রা জাতীয়তাবাদী অহিংস এবং সহিষ্ণু। যার জন্য হিন্দু সমাজ সবাইকে মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে চলে। ফলে রায়ের পর কোনো বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস বা আক্রমণাত্মক ভাষা ও ভঙ্গি দেখা যায়নি। বাস্তবে এই রায়ে কেউ পরাজিত হয়নি কারণ শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ মন্দির-মসজিদের বিবাদ নয় বা হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ নয়— এটা সত্যের জয়।

বর্তমান প্রজন্মের প্রত্যাশা অনেক। আমরা অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। আরও অনেক পথ যেতে হবে। প্রাচীন ঋষি বলেছিলেন 'চরৈবেতি চরৈবেতি'। বর্তমান পৃথিবী অশান্ত, যার ছায়া আমাদের দেশেও পড়ছে। রাষ্ট্রবিমুখ শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজন সদিচ্ছা, প্রয়োজন সাক্ষরতা, প্রয়োজন শুভবুদ্ধি এবং প্রয়োজন জন(হিন্দু) জাগরণ। চাই বিকাশ ও উন্নয়ন। সুতরাং 'সেকুলারবাদীদের' খণ্ডিত ভারতবর্ষ চাই না, চাই সকলের বিকাশ ও সৃজনশীল সমাজ। সুতরাং ভারত নির্মাণের (সঙ্গে মন্দির নির্মাণের কাজ) কাজ যত এগোবে, সমাজে মর্যাদা, বিকাশ, সমরসতা, স্থিতিশীলতা ও হিন্দুশৈলীতে জীবনযাপন ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন প্রজন্ম পাবে শক্তি, বল ও সাহস। ভারত আবার জগৎসভায় 'শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

শ্রীরামজন্মভূমির আন্দোলনের ইতিহাস ও তার পরিণতি আরও একবার প্রমাণ করলো হিন্দু জনজাগরণ ও তার সংহতি ক্ষমতার উৎস। এই জনজাগরণ, সংহতি ও একতা সঠিক ভাবে বজায় থাকলে ও দিশা পেলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সহজেই নতুন করে লেখা যাবে যা এতদিন মূলত 'সেকুলারবাদী' বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং তারাও ইতিহসকে বিকৃত করেছেন। ■

শিশু শিক্ষার প্রসারে একল বিদ্যালয়ের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গুজরাটের একল বিদ্যালয় সংগঠনের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী 'একল স্কুল অভিযান'-এর প্রসারে একল বিদ্যালয় সংগঠনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এর ফলে, গ্রামাঞ্চলে জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। তিনি ভারত ও নেপালের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামাঞ্চলে জনজাতিভুক্ত ২৮ লক্ষ শিশুর মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা গড়ে তোলার কাজে সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, ভারত ও নেপালে গ্রামাঞ্চলে জনজাতির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একল বিদ্যালয় বহু বছর ধরে কাজ করে চলেছে। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের উদ্দেশে একজন শিক্ষক সংবলিত বিদ্যালয় (যা একল বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত) পরিচালনা করাই এর মূল কাজ।

ভারতে ১ লক্ষ একল বিদ্যালয় গড়ে তোলায় প্রধানমন্ত্রী সংগঠনকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, একনিষ্ঠভাবে দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজের ফলেই এই অসাধ্যসাধন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সামাজিক কর্তব্যে দায়বদ্ধতার স্বীকৃতিস্বরূপ এই সংগঠন গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এবং সারা দেশের জন্য যা অনুপ্রেরণার উৎস।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, দেশে শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার কাজ করে চলেছে। তপশিলি উপজাতিভুক্ত শিশুদের জন্য বৃত্তি, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়, পোষণ অভিযান, মিশন ইন্দ্রধনুষের মতো প্রকল্প ও জনজাতিদের নানা উৎসব উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় ছুটি থাকার কারণে স্কুলছুটের হার নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পাশাপাশি, শিশুদের সার্বিক বিকাশেও অগ্রগতি হয়েছে।

২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সংগঠনের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংগীত প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে জনজাতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা-সহ নানা উদ্যোগের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রতিযোগিতাগুলি এ বছর থেকে শুরু হতে পারে এবং ২০২২ সালের মধ্যে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তা শেষ করা যেতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রথাগত ভারতীয় খেলাধুলার জন্য একল পরিবার একটি 'খেল-মহাকুম্ভ'-এর আয়োজন করতে পারে।

'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ধারণাকে উজ্জীবিত করতে গ্রামাঞ্চলের বেসরকারি এবং সরকারি বিদ্যালগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শহরাঞ্চলের বেসরকারি এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের জোটবদ্ধ করার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী দেন। একল সংগঠনের বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া ব্যবহারের তিনি প্রশংসা করেন। শ্রী মোদী বলেন, সব একল বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন তদারকি করতে একটি রিয়েল টাইম ড্যাশবোর্ড ব্যবস্থা সংগঠন গড়ে তুলতে পারে।

আজকের দিনটি ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের 'পুণ্য তিথি' বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছেলে এবং মেয়েদের শিক্ষার সমান সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বাবাসাহেবের স্বপ্ন একল সংগঠন সফলভাবে বাস্তবায়িত করছে। এই পরিবারের বিগত চার দশকের দীর্ঘ যাত্রাপথে সংগঠন 'শিক্ষার পঞ্চতন্ত্র মডেল'-এর ধারণাটির সফল রূপদান করেছে, যার ফলে পোষণ বটিকার মাধ্যমে পুষ্টি, কৃষিক্ষেত্রে জৈব সার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, ঔষধি গাছের ব্যবহারের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। একল বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণরা দেশের শিক্ষা, পুলিশ প্রশাসন, শিল্প এবং সেনাবাহিনীর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল পদচারণায় তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে একল সংগঠনের সাফল্যে গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজের স্বপ্ন, বাবাসাহেবের সামাজিক ন্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় এবং স্বামী বিবেকানন্দের গর্বের ভারতের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করবে।

সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানের সূচনা রাজনাথ সিংহের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বচ্ছতা পাখওয়াড়ার অঙ্গ হিসেবে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে এক প্রচারাভিযানের সূচনা করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। সূচনা অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্বয়ং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পরিষ্কার করার কাজে অংশ নেন। এই প্রচারাভিযানে শামিল হন ৩ হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা।

রাজনাথ সিংহ বলেন, মহাত্মা গান্ধী যেমন একজন সত্যাগ্রহী হিসেবে কাজ করে গেছেন, তেমনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বেচ্ছাগ্রহী হিসেবে কাজ করে চলেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বচ্ছ ভারত এক 'মিশন'-এর রূপ নিয়েছে। দেশের মধ্যে ৭০০টিরও বেশি জেলা উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম মুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই, ১০ কোটি ৬০ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এখন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জনের বিষয়েও জোর দিতে হবে বলেও শ্রী সিংহ জানান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ যদি তাঁদের সঙ্গে ব্যাগ রাখা শুরু করেন, তবেই এই ধরনের প্লাস্টিকের ব্যবহর এড়ানো যাবে, এদিন এই প্রচারাভিযানে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড, জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী, বর্ডার রোড্স অর্গানাইজেশন-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান শামিল হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ প্রচারাভিযানে শামিল সকলকে স্বচ্ছতার শপথবাগ্য পাঠ করান।

উড়ান প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে জম্মু ও কাশ্মীরে এবং বিমানবন্দরের জন্য দরপত্র আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক উড়ান প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের আওতায় জম্মু ও কাশ্মীরে ১১টি এবং লাদাখে ২টি বিমানবন্দরের জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পার্বত্য রাজ্য ও দ্বীপভূমিগুলিতে বিমানবন্দর গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রক জম্মু ও কাশ্মীরে ১১টি অসংরক্ষিত বিমানবন্দর এবং লাদাখে এ ধরনের দুটি বিমানবন্দরের দরপত্র আহ্বান করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পার্বত্য রাজ্য ও জলবেষ্টিত ভূখণ্ডগুলিতে বিমান যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি, পর্যটন শিল্পের বিকাশের স্বার্থেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রক উড়ান প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিমান যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য বিমান সংস্থাগুলিকে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের উদ্দেশ্য হলো— আগামী পাঁচবছরে দেশে ১০০টিরও বেশি বিমানবন্দর থেকে ১ হাজার রুটে বিমান চালানো।

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির মানোন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা বা রেফারেন্স হাসপাতালগুলির সঙ্গে যুক্ত করে নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে থাকে। প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে আরও ৭৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি মিলেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে প্রকল্পের নীতি-নির্দেশিকা অনুযায়ী, নতুন মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতাল স্থাপনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রতিবেদন মন্ত্রকের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়ে থাকে। লোকসভায় আজ লিখিত জবাবে এই তথ্য দেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট ওই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় এখনও পর্যন্ত ৬৪টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে চালু জেলা বা রেফারেন্স হাসপাতালগুলির সঙ্গে যুক্ত করে নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট ওই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৮টি জেলা মেডিকেল কলেজকে চিহ্নিত করা হয়। এখনও পর্যন্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ৭ হাজার ৫০৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলার রামপুরহাট হাসপাতাল, কোচবিহার জেলা হাসপাতাল, ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল, পুরুলিয়া হাসপাতাল এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ হাসপাতালে প্রতিটির জন্য ১১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা করে কেন্দ্রীয় অর্থ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে বলেও শ্রী চৌবে জানান।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

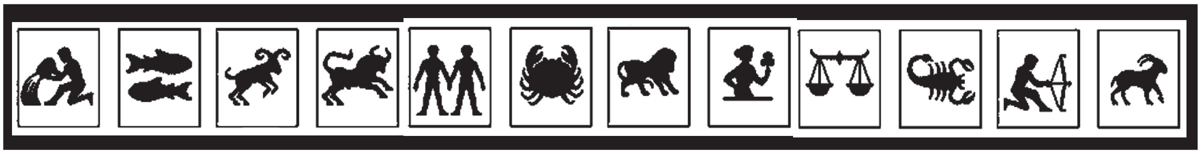

১৬ ডিসেম্বর (সোমবার) থেকে ২২ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, তুলায় মঙ্গল, বৃশ্চিকে রবি, বুধ, ধনুতে বৃহস্পতি, শনি, কেতু, মকরে শুক্র। ১৬-১২ সোমবার, বৈকাল ৩-১২ মিনিটে রবির ধনুতে প্রবেশ রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কর্কটে অশ্লেষা নক্ষত্র থেকে তুলায় স্বাতী নক্ষত্রে।

মেষ : পিতা-মাতার সহায়তায় বিশেষ কোনো বাসনার পূর্তি। লাভজনক ব্যবসা হলেও নতুন বিনিয়োগ স্থগিত রাখুন। বিদেশ যাত্রার লোভনীয় হাতছানি ও নিসর্গ দর্শনে অনাবিল আনন্দলাভ। গ্রামাঞ্চলে ভূ-সম্পত্তি ক্রয়। বিশিষ্টজনের সহায়তায় কর্মে সুস্থিতি ও সম্মান। পুরানো প্রেমজ সম্পর্কে উদ্বেলিত মন। পরোপকারী ব্যক্তিত্বের জন্য সাধুবাদ ও সৃজনশীলতার প্রকাশ। উদরপীড়ায় ক্লেশ।

বৃষ : কর্ম পরিবর্তনের শুভ যোগ তবে প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে নেতিবাচক ফল, পারিবারিক শান্তি রক্ষার্থে জীবনসঙ্গীর দূরদর্শিতার কার্যকরী প্রভাব। সন্তানের বিবাহ বিষয়ক সফল আলোচনা। বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক আইনি জটিলতার অবসান ও নব-নির্মাণে তৎপরতা। মায়ের শরীরের যত্ন নিন। কনিষ্ঠদের যোগ্যতার পূর্ণ মূল্যায়ন। খনিজ ও পরিবহণ ব্যবসায় শুভ।

মিথুন : প্রতিবেশী ও স্বজন থেকে সতর্কতা, কাউকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হতে পারেন। জীবনসঙ্গীর সরকারি সম্মান, পদোন্নতি, উচ্চপদস্থের আনুকুল্যে প্রতিষ্ঠা ও স্বাচ্ছন্দ্য। শিল্পী, কলাকুশলী ও ভাস্করের উদ্ভাবনী শক্তির আনন্দধারায় নব-সংযোজন, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। কর্মের যোগসূত্রে বিবাহবন্ধনের যোগ। বিদ্যার্থীর আলস্য ও অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়।

কর্কট : শ্রীযুক্ত কান্তিমান, বিদ্বান, পুত্রবান, লোকমান্য-বন্ধুপ্রিয়, ব্যবসা ও ধর্ম-কর্মে যুগপৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপাবর্ষণ। পুলিশ, মিলিটারি, ক্রীড়াবিদ, শল্যচিকিৎসকের কারিগরি কুশলতা বৃদ্ধি ও শংসা প্রাপ্তি। সন্তানের অসৎ সঙ্গ ও অসামাজিকতায় উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি।

সিংহ : পেশাদারিত্বে দক্ষতা ও ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তের মেলবন্ধনে জটিল সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের শংসা ও পদোন্নতি। বিদ্যার্থী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকের জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধায় শুভ কর্মপথে সাফল্য ও প্রাণপূর্ণ সুখকর জীবনের সূচনা। ব্যক্তিত্বের কাছে চক্রান্তের পরাজয়। তবে পারিবারিক অসুস্থতায় মানসিক অবসাদ।

কন্যা : প্রতিবেশীর প্ররোচনায় জীবনসঙ্গীর চঞ্চলগতি ও জেদের কারণে বয়স্কদের বিরাগভাজন, সন্তানের অবিধিপূর্বক আচরণ। ভ্রাতা-ভগ্নীর দায়িত্বহীনতা মনঃচাঞ্চল্যের কারণ। বিদ্যার্থীদের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থতায় প্রতিভার ব্যাপ্তি ও তমসার অবসানে প্রজ্ঞার দীপ্তিতে উর্বর চিত্তভূমি। কীট-পতঙ্গ ও শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট- আঘাতে সতর্ক থাকা দরকার।

তুলা : কর্মে কারও বিসদৃশ আচরণে হওয়া কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। দুর্জন-বকধার্মিক ব্যক্তি থেকে সতর্ক ও রমণীর স্নেহ সান্নিধ্যে বিরহ বেদনার পূর্ণতা। স্বজন বান্ধবের অনৈতিক আচরণ ও ব্যয়বাহুল্যে মানসিক শান্তিতে বিঘ্ন। পুরাতন সামগ্রী বিক্রয় নতুন বস্তু ক্রয়। দুর্জন প্রতিবেশী স্বজনে পরিণত। পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ে ভ্রাতৃ বিরোধের অবসান। সন্তান সম্ভাবার নেতিবাচক ফলে দুঃখ।

বৃশ্চিক : ঈর্ষাকাতর সহকর্মীর কারণে আসন্ন সিদ্ধি করায়ত্ত হয়েও অধরা থাকার সম্ভাবনা। পুরানো সঞ্চিত অথবা গচ্ছিত অর্থের প্রাপ্তি। কর্মপ্রার্থীর প্রত্যাশা পূরণ। সরলতা, স্নেহপ্রবণতার যথার্থ মূল্যায়ন না পাওয়ার ক্লেশ। রমণী সান্নিধ্যে নিন্দার দাবানল মোচনার্থে বিহ্বল চিত্ত। উত্তেজনাকর পরিবেশ কৌশলী মানসিকতা পরিহার করুন।

ধনু : পিতার বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যহানি। কর্মপ্রার্থীদের অনুকূল সময় ও কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তি। নতুন কর্মপরিকল্পনা স্থগিত ও আবেগ প্রবণতা, আইনি ঝামেলা পরিহার করুন। সাহায্যের প্রসারিত হস্তে ঋণবৃদ্ধি। নারী জাতিকাদের আড়ম্বর পূর্ণ বিবাহ, অনুষ্ঠান। নীতিগত ব্যাপারে আপোশহীন মনোভাব আনন্দের ও মর্যাদার।

মকর : গৃহের পরিবেশ ও নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। অহেতুক ক্রোধ ও গোপন শত্রুতায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি। সপ্তাহের মধ্যভাগে কর্মে সন্তোষজনক পরিস্থিতির সম্ভাবনা। সন্তান ও অগ্রজের প্রগতি। পিতা-মাতার সহায়তা সত্ত্বেও সঞ্চয়ে হাত পড়ার সম্ভাবনা। বৈদেশিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ, স্ত্রীর নামে ব্যবসায় শুভ।

কুম্ভ : স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই শরীরের যত্নের প্রয়োজন। সুচিকিৎসায় বিলম্ব। স্ত্রীর হঠকারী পদক্ষেপে প্রতিবেশীর বিরূপতা। রাজনীতিকদের নয়া উন্মাদনা। কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতিকে কাজে লাগান। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কৃপা বর্ষিত হবে। বিদেশে গবেষণার সুযোগ। বাহন চালক ও মাতুলালয়ের দুঃসংবাদে উদ্বেগ।

মীন : বিরোধ, রাজকোষ, বন্ধন, স্থানান্তর, আঘাত, পতনজনিত কষ্ট, অর্থ ও গবাদি পশুহানি, বিদ্রুপ, বিচ্ছেদ, অসৎসঙ্গ, অতৃপ্তভাব, অবিধিপূর্বক আচরণে স্বেচ্ছাচারিতা। সপ্তাহের প্রান্তভাগে জীবনের ঝরা পাতায় শ্রীবৃদ্ধি সকলের সঙ্গে হৃদ্যতা, প্রবাসী বন্ধুর সহায়তায় সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের শুভ সূচনা।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—**শ্রী আচার্য্য**